বার্ষিক চাঁদা—৩৲
প্রতি সংখ্যা—৵০

Regd. No. C.—1356

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

দশম বর্ষ

চতুর্বিংশ সংখ্যা

৩১শে মাহে ফত্‌হে—১৩১৯ হিঃ, শঃ] —— [৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৪০ ইং

بسم الله الرحمن الرحيم—نحمده و نصلى على رسوله الكريم

هو الناصر

কোরান করীমের অনুবাদ ও সালানা জলসা বা বার্ষিক সম্মেলন

আহমদীয়া জমাতের বর্ত্তমান ইমাম হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ ছানির (আইঃ) ১৩ই ডিসেম্বর তারিখের খোৎবার সারমর্ম্ম

কোরান করীমের অনুবাদ

সুরা ফাতেহা পাঠের পর বলেন :—

কয়েক দিন হইতে আমার শরীর অপেক্ষাকৃত অধিক অসুস্থ। আজকাল কোরান-করীমের তরজমা (অনুবাদ) ও তফসীরের (ব্যাখ্যার) কাজের চাপ খুব বেশী; জলসা নিকটবর্ত্তী, অথচ কিতাবের এক শত পৃষ্ঠা এখনো লিখা বাকী আছে। আজকাল আমাকে প্রায়ই রাত্রি ৩টা, ৪টা, বরং ৫টা পর্য্যন্তও কাজ করিতে হয়। অতএব শরীর এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, এরূপ কাজের বোঝ আর অধিক কাল বহন করিতে পারিবে না। জলসার আর অল্প দিন বাকী আছে; অতএব বন্ধুগণ দোয়া করিবেন, যেন আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে এই কার্য্য উত্তমরূপে সম্পাদন করিবার তৌফিক দেন। যাঁহারা কপি ঠিক করিয়া এবং বিষয় পুনরায় পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া আমাকে এই কার্য্যে সাহায্য করিতেছেন তাঁহারাও বহু পরিশ্রম করিয়া কাজ করিতেছেন। প্রত্যহ এতক্ষণ পর্য্যন্ত কাজ করার তাঁহাদের অভ্যাস নাই, তবু রাত্রি ২টা ৩টা পর্য্যন্ত তাঁহারা কাজ করিয়া থাকেন। তদ্রূপ কাতেবের (অনুলিপিকারীর) কাজও বড় কঠিন ও পরিশ্রমের কাজ। চক্ষু সর্ব্বদা এক দিকেই নিবদ্ধ থাকে, এক মিনিটের জন্যও চক্ষু এদিক সেদিক হইতে পারে না। কাতেবকে সর্ব্বদা চক্ষু কাগজে এবং কলম হাতে করিয়া বসিয়া থাকিতে হয় এবং বসারও একটি বিশেষ পদ্ধতি আছে। বস্তুতঃ ইহা আজীবন কারাবাসের সাজা স্বরূপ এবং দেখা গিয়াছে যে, কাতেবগণ শীঘ্র বৃদ্ধ হইয়া যায়। কাতেবের কাজের তুলনায় তছনীফ বা প্রণয়নের কাজ এত কঠোর পরিশ্রমের নহে। প্রণয়নকারী কখন পড়ে, কখন বসিয়া থাকে, কখন রেফারেন্স তালাস করে, কখন লিখে এবং যাহা লিখে তাহাও নিজের ইচ্ছা মত লিখে। কিন্তু কাতেবকে দুই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে হয়—এক দিকে প্রণেতার manuscript বা হস্তলিপির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়, অপর দিকে নিজের কপির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে হয়।

বস্তুতঃ কাতেবের অবস্থা দয়াহ'। এখন যাহারা কাতেবের কাজ করিতেছেন তাঁহাদের উপর কাজের বোঝও অত্যধিক। কাতেব ভাল লিখিলে সাত আট পৃষ্ঠা করিয়া দৈনিক লিখিতে পারে, কিন্তু এখন কাজের চাপ বাড়িয়া যাওয়ায় এক এক জন কাতেবকে পনর ষোল পৃষ্ঠা করিয়া দৈনিক লিখিতে হইতেছে, কারণ এরূপ না করিলে জলসা পর্য্যন্ত কার্য্য শেষ হইবে না।

তার পর রহিল ছাপানের কাজ। খোদাতা'লার ফজলে ছাপানের কাজের বেশ সুবিধা হইয়াছে। দুইটি প্রেস কাজ করিতেছে এবং মেশিনে কাজ হইতেছে এবং বিজলির সাহায্যে মেশিন চলিতেছে। প্রেসের লোক দৈনিক ৪৮ পৃষ্ঠা ছাপাইয়া দিবার ওয়াদা করিয়াছে। এ পর্য্যন্ত ৭৫০ পৃষ্ঠা ছাপান হইয়াছে এবং আরো প্রায় পণে দুই শত পৃষ্ঠা বাকী আছে। যাহা হউক এ সম্বন্ধে কোন উদ্বিগ্নতার কারণ নাই। অবশ্য কাতেবের কাজ বড়ই উদ্বিগ্ন হইবার কাজ, এক জন কাতেব যদি রুগ্ন হইয়া পড়ে তবে কাজ আটকিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

তার পর রহিল বই বাধানের কাজ। দপ্তরী হইতে ওয়াদা লওয়া হইয়াছে যে, ছাপানের কাজ শেষ হইলে দৈনিক ৭৫ খানা করিয়া বই বাঁধিয়া দিবে। এই হিসাবে ৩০শে বা ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত আট নয় শত কিতাব জিলদ-করা পাওয়া যাইতে পারে এবং বাকী পরে পাওয়া যাইবে। কিন্তু দফ্‌তরীগণ সাধারণতঃ বড়ই টাল-বাহানা করিয়া থাকে। এক বার হজরত খলিফাতুল-মসিহ আওয়াল (রাঃ) নোওয়াব মোহাম্মদ আলী খান সাহেবের নিকট এক খানা

বই চাহিয়াছিলেন। নোওয়াব সাহেব উত্তর দিলেন যে, বইখানা দফ্‌তরীর কাছে আছে। কিছু দিন পর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলে নোওয়াব সাহেব সেই উত্তরই দিলেন। অতঃপর বৎসর দুই এক পর পুনরায় চাহিলেন, তখনো নোওয়াব সাহেব ইহাই বলিলেন যে, দফ্‌তরীর কাছে রহিয়াছে। হজরত খলিফা আওয়াল বলিলেন, "আপনি কি দফ্‌তরীর জন্যই কিতাব খরিদ করিয়াছিলেন? আমি যখনই চাই আপনি বলেন, দফ্‌তরীর কাছে আছে।" নোওয়াব সাহেব বলিলেন, "বই-ত আজ আঠার বৎসর যাবৎ তাহার কাছে পড়িয়া আছে। লাইব্রেরীর কতিপয় পুস্তকের জিল্‌দ ইঁদুরে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহা জিলদ করিবার জন্য দফ্‌তরীর কাছে দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সে সে-গুলি ফিরাইয়া দেয় নাই।" অবশেষে দীর্ঘকাল পর দফ্‌তরী কিতাবগুলি আনিয়া এই বলিয়া ফেরত দিয়া গেল যে, "আপনি এত তাড়াতাড়ি করেন, আপনার কেতাব আপনি ফিরাইয়া নিন, আমি এত তাড়াতাড়ি কাজ করিতে পারিব না"। বস্তুতঃ দফতরী সম্বন্ধে বড়ই ভয় হয়; অতএব বন্ধুগণ দোয়া করিবেন যেন, খোদাতা'লা এই ঘাটও নিরাপদে পার করিয়া দেন।

মোট কথা, এখন কয়েকটী ঘাটই আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। অতএব সকলে দোয়া করিবেন যেন সকল ঘাটই অতিক্রম করিবার আল্লাহ্‌ তৌফিক দেন। এখনো সুরাহ্‌ কাহাফের ব্যাখ্যা লিখার কাজ আমার জিম্মায় আছে; সুরাহ্‌ 'বনি-ইস্রাইল, এবং সুরাহ্‌ কাহফের লিপি কার্য্য কাতেবের জিম্মায় আছে; এবং সুরাহ্‌ 'নহল', সুরাহ্‌ বনিইস্রাইল ও সুরাহ্‌ কাহাফের মুদ্রণের কার্য্য প্রেসের জিম্মায় আছে; প্রুফ দেখার কাজ এবং আমার লিখিত বিষয় পুনরায় পরিষ্কার করিয়া লিখার কাজ আমার সাহায্যকারীগণের জিম্মায়। অতঃপর দফ্‌তরীর কাছে যাইবে। দফ্‌তরীর সহিত প্রয়োজনীয় সর্ত্তাদি ঠিক করা হইয়াছে এবং অগ্রীম টাকাও দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু মানুষের চেষ্টা কিছুই না, যে-পর্য্যন্ত খোদাতা'লার সাহায্য লাভ না হয়। অতএব খুবই দোয়ার দরকার। এই কার্য্যের জন্য দুই মাস যাবৎ আমার উপর এবং এক মাস যাবৎ আমার সাহায্যকারীগণের উপর সাধ্যাতীত বোঝ পড়িয়াছে। খোদাতালার ফজল (অনুগ্রহ) ও নুছরত (সাহায্য) না হইলে অধিক কাল এই বোঝ বহন করা মুশকিল। অতএব বন্ধুগণ দোয়া করিবেন যেন আল্লাহ্‌তালা সফল-কাম করেন।

সালানা-জলসা বা বার্ষিক সম্মেলন

অতঃপর আমি সালানা জলসা বা বার্ষিক সম্মেলনের প্রতি বন্ধুগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। সালানা-জলসা আমাদের মাথার উপর দণ্ডায়মান। সকলে দোয়া করিবেন যেন খোদাতা'লা লোকদিগকে জলসায় যোগদানের জন্য অনুপ্রাণিত করেন এবং জলসার 'বরকত' বা আশীষ হইতে কল্যাণ লাভ করিবার জন্য তৌফিক দেন এবং কাদিয়ানের বন্ধুগণের এই দোয়া করা উচিত যেন তাহারা বাহির হইতে আগত অতিথিগণের জন্য গৃহ, অর্থ ও সময়ের কোরবাণীর দিক দিয়া এবং ধর্ম্ম-পরায়ণতা, আন্তরিকতা ও শুভেচ্ছা প্রদর্শনের দিক দিয়া উত্তম সেবক ও মেজ্‌বান (host) প্রতিপন্ন হন। কাদিয়ানবাসীগণ যদি এই ভাবে দোয়া করেন তবে আমার ওয়াজ-নছিহত ব্যতীরেকেই তাঁহারা নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হইবেন। যথা, কেহ যদি এই দোয়া করে যে, "যাহার কাছে ঘর আছে অতিথিদের জন্য তাহা উন্মুক্ত করিয়া দিবার তাহার তৌফিক বা ক্ষমতা লাভ হউক" তবে তাহার বিবেক তাহাকে বলিবে, "তোমার নিজেরও এরূপ করা বচিত"। তদ্রুপ যে-ব্যক্তি দোয়া করিবে যে, 'যাহার কাছে অর্থ আছে তাহার আর্থিক কোরবানী করিবার ক্ষমতা লাভ হউক" সে ব্যক্তির বিবেক তাহাকে বলিবে, অপরের জন্য যাহা চাও নিজেও তাহা কর। বস্তুতঃ যাঁহারা অপরের জন্য দোওয়া করিবেন তাঁহাদের নিজের হৃদয়েও এক পরিবর্ত্তন আসিবে এবং তাঁহারা নিজরাও পুণ্য কাজ করিবার তৌফিক হাছেল করিবেন। অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, দোওয়া আত্ম-শুদ্ধির সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ উপায়, কারণ যে-ব্যক্তি অপরের জন্য দোওয়া করে সে নিজেও তদ্রুপ হইতে চায় এবং এই প্রেরণাই পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য যথেষ্ট। এইরূপে বাহিরের বন্ধুগণ যখন এই দোয়া করিবেন যে, আল্লাহ্‌তা'লা বন্ধুগণকে অধিক হইতে অধিকতর সংখ্যায় সম্মেলনে যোগদান করিবার তৌফিক দিন, তখন তাঁহাদের বিবেক তাঁহাদিগকে বলিবে, "অপরের জন্য যখন সম্মেলসে যোগদানের তৌফিক চাও, তখন নিজেও যোগদান করিতে চেষ্টা কর"।

বস্তুতঃ, দোয়া এক পক্ষে আত্ম সংশোধনের, পক্ষান্তরে খোদাতা'লার 'ফজল' বা অনুগ্রহ আকর্ষণ করিবার মস্ত বড় উপায় এবং এই দুইটি জিনিষ একত্রিভূত হইলে কৃতকার্য্যতা লাভে আর কোন সন্দেহ থাকে না।

আমি এখন এতদধিক আর কিছু বলিতে পারি না। কেননা বড়ই অসুস্থ অনুভব করিতেছি। আমি পুনরায় উপরুক্ত দুইটি বিষয়ের জন্য দোয়া করিতে অনুরোধ করিতেছি—অর্থাৎ বার্ষিক সম্মেলন পর্য্যন্ত কোরাণের ব্যাখ্যা প্রকাশের কাজ সুচারুরূপে সমাপ্ত হইবার জন্য এবং এই কার্য্যে যাঁহারা আমাকে সাহায্য করিতেছেন তাঁহাদের প্রতি খোদাতা'লার অনুগ্রহ বর্ষিত হইবার জন্য, দ্বিতীয়তঃ কাদিয়ানের আহমদীগণের নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদনের তৌফিক লাভ হইবার জন্য এবং সকল বন্ধুগণের কাদিয়ান আসিবার এবং অপরকে সঙ্গে লইয়া আসিবার সঙ্গতি হাছেল হইবার জন্য, যেন এই সম্মেলন পূর্ব্বকার সম্মেলন হইতে অধিকতর সফলতা-মণ্ডিত হয় এবং ইহা প্রতিপন্ন হয় যে, খোদাতা'লার ধনাগার কখনো শেষ হইবার নহে, তাহা হইতে বান্দাগণ অধিক হইতে অধিকতর কল্যাণ ও আশীষ লাভ করিয়া আসিতেছে এবং করিতে থাকিবে।

জাতিবিদ্বেষ ও জগতের ভবিষ্যৎ

[শ্রীমতী এলা মাইলার্ট লিখিত]

কাগজে যখনই সুদূর প্রাচ্যের কোনও সংবাদ পড়ি তখনই একটি ঘটনা স্পষ্ট হইয়া আমার মানস-চক্ষে ভাসিয়া উঠে। ঘটনাটি কয়েক বছর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল।

জাপানীরা এখন পিকিং-এ বেশ কায়েমী হইয়া বসিয়াছে। সাংহাইয়েও তাই। সাংহাইয়ের সংস্কার-বিরোধীদের আখড়া আন্তর্জাতিক এলাকাকে পর্য্যন্ত জাপানের অধীনতা স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে। ক্যাণ্টনে, ইয়াংসি নদীর তীরবর্ত্তী অঞ্চলগুলিতে, হাইনানে, ফরাসী-ইন্দোচীনের বিভিন্ন অংশে জাপানীরা অবলীলাক্রমে অধীকার বিস্তার করিয়া বসিয়াছে—একমাত্র চীন ছাড়া ইহার বিরুদ্ধে কেহ অঙ্গুলি মাত্র উত্তোলন করে নাই। আজ ভিসি সরকারের দুর্ব্বলতার সুযোগ হইয়া জাপানী যুদ্ধ জাহাজগুলি সাইগন বন্দর অধিকার করিবার হুমকি দিতেছে। জাপানের এই রাজ্যবিস্তারের ফলাফল বহু বিস্তৃত হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। জন-সাধারণ ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে না-পারায় মনে হয় এশিয়ার মানচিত্রের সম্বন্ধে হয়ত তাহাদের ধারণা তেমন স্পষ্ট নহে।

১৯৩১ সালে মাঞ্চুরিয়ার পতন হয়। "জোর যার মুল্লুক তার" নীতির নিকট লীগ-অব-নেশান তখনই প্রথমবার মাথা নত করে। ইহার চার বৎসর পরে ১৯৩৫ সালে এশিয়ায় জাপানে রাজ্যবিস্তারের সেই অধ্যায়টিকে আয়ত্ত করিবার জন্য একটি ফরাসী সংবাদপত্র কর্ত্তৃক আমি সেখানে প্রেরিত হই। জাপানের এই রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা কি সফল হইয়াছে? জাপানী প্রভুরা চীনাদের প্রতি কেমন ব্যবহার করিতেছে? সুদূর প্রাচ্যে কি জাপানের আরও রাজ্যবিস্তারের ইচ্ছা আছে?

পূরা তিন মাস আমি বিশাল মাঞ্চুকো দেশের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া ফিরি। মাঞ্চুকো আয়তনে ভারতবর্ষের নিজাম রাজ্যের তিনগুণ। পরিভ্রমণ কালে জাপানী পুলিশ আমাকে কতবার যে গ্রেপ্তার করিয়াছে তাহার ঠিক নাই। রেলগাড়ী হইতে টানিয়া নামাইয়া আর উঠিতে দেয় নাই; অতি উৎসাহী ক্ষুদে কর্ম্মচারীরা ছাড়পত্র ইত্যাদি পরীক্ষা করার ভাণ করিয়া বহু জ্বালাতন করিয়াছে। বার বার আমার ক্যামেরা বাজেয়াপ্ত করিয়াছে। লিখিয়া অসংখ্য প্রশ্নের জবাব দিতে হইয়াছে এবং এমন জবাবই লিখিয়াছি যে তাহা দিয়া এক হাস্যকৌতুকের বই লেখা চলিবে।

আমি বহু ইউরোপীয় ও আমেরিকান ব্যবসায়ীর সহিত সাক্ষাৎ করি। মাঞ্চুকোতে সকল জাতিরই বাণিজ্য করিবার সমান অধিকার আছে বলিয়া জাপানীরা যে ঢাক পিটাইতেছিল, ইহারা সকলেই তাহাকে বাজে কথা বলিয়া উপহাস করেন, বলেন, ধাপ্পাবাজী ছাড়া আর কিছুই নহে, কারণ বিদেশীর পক্ষে তখন সেখানে ব্যবসা চালানো প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। ছোট ছোট কত গ্রামে আমি খৃষ্টান মিশনারীদের সহিত দেখা করিয়াছি; চীনারা তাহাদের বিশ্বাস করে বলিয়া এই মিশনারীদেরও জাপানীদের হাতে কম নিগ্রহ ভোগ করিতে হয় নাই। একবার এক ভাইস্‌-কন্‌সালের সহিত আমার দেখা হইয়াছিল, ক্ষ্যাপা জাপানী সৈন্যেরা একবার তাহার বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া পিটাইয়া তাহাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিয়াছিল। আমি একবার সেখানকার কতগুলি রাশিয়ান 'রেফুজির' (বিদেশে আশ্রয়প্রার্থী) অতিথি হইয়াছিলাম; তাহাদের কাছে শুনিলাম যে জাপানীরা তাহাদের গায়ে থুতু দেয় এবং সকল রকম জুলুম করে। সোভিয়েট সীমান্তের নিকট দিয়া যে রেল লাইন তৈয়ারী আরম্ভ হইয়াছিল মোটরলরী চাপিয়া তাহার ধার দিয়া ঘুরিয়া দেখিয়াছি। যে সকল জাপানী ইঞ্জিনীয়ার লরীতে আমার সহযাত্রী থাকিত জাপানী সৈন্য কাছে থাকিলে তাহারা আমার সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেও ভয় পাইত। জাপানীদের সাক্ষাতে চীনদের সহিত দেখা করাও আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল। কিন্তু সর্ব্বত্রই আমি জাপানীদের প্রতি চীনের জনসাধারণের তীব্র হিংসা লক্ষ্য করিয়াছি।

নিজেকেও ভুগিতে হইয়াছে

এইতো গেল পরের কথা। জাপানীদের হাতে নিজেকেও ভুগিতে হইয়াছে।

দারুণ শীত পড়িয়াছে, সাইবেরিয়ার শীত যে কেমন তীব্র হয়, তাহা বলিয়া বুঝান যায় না। এই শীতে কয়দিন ধরিয়া সেকেলে যানবাহনে চলিবার পর অবশেষে ভ্লাডিভোস্‌টক ও হার্‌বিনের মধ্যে যে মেইন লাইন চলিয়াছে তাহারই এক ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম। "চাইনিজ ইষ্টার্ণ রেলওয়ে" নামক এই রেলপথটি তখনও সোভিয়েটের হাতে। এই পথের ট্রেনগুলি প্রায়ই দস্যুদল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইত। কিন্তু বৃহৎ ট্রেণটা আমাকে কেমন একটা নির্ভরতার ভাব জোগাইল। তৃতীয় শ্রেণীর এক কামড়ায় জায়গা পাইয়াছিলাম; বেশ নিশ্চিন্ত হইয়া গেলাম। দস্যুরা যাহাতে হঠাৎ আড়াল হইতে আসিয়া আক্রমণ করিতে না পারে সেই জন্য ট্রেণের আগে আগে অস্ত্রসজ্জিত আরও একটা ইঞ্জিন চলিতেছে। নিরপত্তার জন্য আমাদের ট্রেণ রাত্রে কোনও এক ষ্টেশানে থামিয়া থাকিত; মাঞ্চুপুলিশ এবং শ্বেত-রাশিয়ান প্রহরীরা ষ্টেশানের চতুর্দ্দিকে পাহারা দিতে থাকিত।

প্লাটফর্ম্ম হইতে খানা-কামরায় ঢুকিয়া পেট ভরিয়া ডিনার খাইলাম। কাচের বাসনে মাছের ডিমের যে চচ্চড়ি দেওয়া হইয়াছিল তাহা দুনা খাইয়া ফেলিলাম—এমনই ক্ষিধা পাইয়াছিল।

পরদিন প্রভাতে ঘুম ভাঙ্গিলে দেখা গেল বরফ ঢাকা রাজ্যের মধ্য দিয়া আমাদের গাড়ী চড়াই পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। প্রাতরাশের জন্য প্রস্তুত হইয়া কাম্‌রার বাহিরে আসিলাম; এইবার খানা-কামরায় যাইতে হইলে পাশের গাড়ীটার বারান্দার ভিতর দিয়া যাইতে হইবে। আগাইয়া দেখিলাম গাড়ীটা জাপানী সৈন্যে ভর্ত্তি। আমি সেদিকে আর না চাহিয়া অগ্রসর হইলাম।

প্রায় অর্দ্ধেকটা পার হইয়া গিয়াছি এমন সময় সৈন্যগুলি হাঁকডাক করিয়া বাহির হইয়া আসিয়া আমাকে থামাইল এবং কয়েকজন আমার দিকে রাইফেল তাগ্‌ করিয়া ধরিল, যেন এখনই গুলি ছুড়িবে। অবাক হইয়া গেলাম। আমি তো

ইহাদের কিছুই করি নাই। মুখে হাত ছোঁয়াইয়া বুঝাইলাম আমি খাওয়ার জন্য যাইতেছিলাম। কিন্তু কে তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করে। আমার চতুর্দ্দিকে খাকীপরা আরও বহু বেঁটেলোক আসিয়া ভীড় করিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের ভাবভঙ্গি রীতিমত ভয় পাইবার মত।

অকস্মাৎ আমার স্মরণ হইল যে সে-দিনই ভোরবেলায় দেখিয়াছি দরজার কাছের ঐ জাপানী সৈন্যটা দুই জন রাশিয়ান স্ত্রীলোককে থাপ্ড়াইয়া পিছনে ঠেলিয়া দিয়াছে, তাহাদের কোলে শিশু দেখিয়াও সামান্যমাত্র দ্বিধা করে নাই। এমন সময় আমাকেও ঠেলিয়া দেওয়া হইল। প্রত্যুত্তারে আমি জাপানী যুবাটির হাতে মৃদু আঘাত করিলাম; আমার শুধু ঐটুকু বুঝানই উদ্দেশ্য ছিল যে আমার দেহ স্পর্শ করা তাহার উচিত হয় নাই। দেখিলাম চতুর্দ্দিকের মুখগুলি আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে। বুঝিলাম, ইহা পরিহাসের জায়গা নয়।

পিঠে লাথি

সুতরাং পিছু হইতে লাগিলাম, তবে সন্ত্রান্ততা বিসর্জ্জন দিয়া দৌড়াইয়া পালাইতে পারিলাম না। ইহাতে সৈন্যগুলি এমনই রাগিয়া গেল যে অকস্মাৎ তাহারা আমাকে অবিচারে থাপড়াইয়া, পিটাইয়া পেটে লাথি মারিয়া একশেষ করিল। কিন্তু আজ সবচেয়ে আমার বেশী করিয়া মনে পড়িতেছে সেই সকলের সম্মিলিত ক্রোধের ছবিটা, সেই বিকট মুখভঙ্গী ও চোখের ভয়ঙ্কর চাহনিগুলি। এতগুলি লোক একই সঙ্গে এমন রাগিয়া যাইতে পারিল কি করিয়া?

সরিতে সরিতে দরজার কাছে যাইয়া গাড়ীর পাদানীতে পা দিবার জন্য আমাকে পিছন ফিরিতে হইল। অমনি আমার পিঠে পড়িল লাথি। ব্যাগটা হাত হইতে খসিয়া বাহিরে ছিটকাইয়া যাইবার জোগাড় হইয়াছিল, কোনও রকমে বাঁচিয়া গেল। এই ব্যাগের মধ্যেই আমার পাশপোর্ট (ছাড়পত্র) ছিল, সেটি খোয়া গেলে মুস্কিলের আর সীমা থাকিত না। এক মুহূর্ত্তের জন্য আমার ধৈর্য্য টুটিয়া গেল; পিছনে ফিরিয়া কাছে যে লোকটাকে পাইলাম, তাহার গালে গায়ের জোরে এক চড় বসাইয়া দিলাম। চকিতে ক্রুদ্ধ জাপানী সৈন্যটা কোমরবন্ধ হইতে একটা কিরীচ টানিয়া বাহির করিল। ছল কথা নয়! মহামহিম জাপানের এমন কৃতী সন্তানের গায়ে কিনা একজন সামান্য স্ত্রীলোক হাত তুলিতে সাহস করে! যদিও ভয়ে প্রায় আধমরা হইয়া উঠিয়াছিলাম, তবুও অকস্মাৎ হো হো করিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলাম। এই হাসিতে সেই জানোয়ারগুলিও অবাক হইয়া গেল; আমিও কম অবাক হইলাম না।

জাপানী সৈন্যগুলি তখনও আর সম্মুখে। আমি পিছন দিকে হাত বাড়াইয়া কোন রকমে পরের কামরার দরজাটা খুলিয়া ফেলিলাম এবং চট্ করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া গেলাম।

আমার চোখে জল দেখিয়া গার্ড আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল কি হইয়াছে। ঘটনাটা তাহাকে খুলিয়া বলিলাম। একটা নিরুপায় দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া সে বলিল; তবে ওরা এমন লোকের উপরও অত্যাচার করে যার রীতিমত পাস্পোর্ট আছে, এদেশে যাদের দেশের কনসাল্ আছে। আপনিও উল্টা চোট দিয়া ক্ষতি আদায় করিয়া লইতে পারেন। পরের ষ্টেশনেই একজন ডাক্তারকে দিয়া পরীক্ষা করাইয়া নিন। এই দেশে যে কি সব কাণ্ডকারখানা হইতেছে সব যদি জানিতেন। এই হারামজাদারা প্রতিদিনই শ্বেত-রাশিয়ানদের উপর নাহক অত্যাচার করে, কারণ জানে, বেচারীরা কাহারও কাছে নালিশ করিতে পারিবে না।"

পরের ষ্টেশনে কিছু পানাহার করিয়া গায়ে জোর ফিরিয়া পাইলাম। প্রত্যেকেই বলিল সৈন্যগুলিকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া উচিত। এ বিষয়ে রেলওয়ে সোভিয়েট কর্ম্মচারী ও মুঞ্চোকে সরকারের শ্বেত-রাশিয়ান পাহারাওয়ালাদের মধ্যে আশ্চর্য্য মতের মিল দেখা গেল। কিন্তু একজন ধীরস্থির লোক আমাকে সাবধান করিয়া দিল। সে বলিল—সৈন্যবিভাগ ও অন্যায়ের কোনও প্রতিকারই করিবে না; সৈন্যেরা কোনও রকমে প্রমাণ করিয়া দিবে, আমি মাতাল অবস্থায় ছিলাম (হ্যা, ভোর সাতটাই) এবং সৈন্যদের ফুস্লাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।

একে আমার পোষাক পরিচ্ছদ গরীবের মত ছিল; তাহার উপর তৃতীয় শ্রেণী হইতে আমাকে বাহির হইয়া আসিতে দেখায় জাপানী সৈন্যেরা বোধ হয় আমাকে "রেফুজি" মনে করিয়াছিল। কিন্তু রেফুজি হইলেও কামরার পাশ দিয়া যাইতে বাধা দেওয়ার কোন সঙ্গত অধিকারই জাপানী সৈন্যগুলির ছিল না। এমন অকারণে জাতিবিদ্বেষ জাগিয়া উঠিবার কোনও অর্থই হয় না। এই অদ্ভুত ব্যবহারের প্রকৃত কারণ কি? এই প্রশ্নের জবাব খুঁজিতে গেলেই সুদূর প্রাচ্যের মূল সমস্যার সন্ধান মিলিবে।

সেই মুহূর্ত্তে আমি অবশ্য জাপানীগুলিকে ঘৃণা করিয়াছিলাম, মনে হইয়াছিল, কোনও বিভৎসতাই উহাদের পক্ষে অসম্ভব নহে। ১৯২৮ সালে লীগ-অব-নেশানে এক চলচ্চিত্র দেখি; তাহাতে জাপানীদের চীন অধিকারের ছবি দেখান হয়। এই চুরি করিয়া আমদানী করা ফিল্মটিতে যে সকল ঘটনা দেখিয়াছিলাম, তাহাতেও আমার ঐরূপই মনে হইয়াছিল। কিন্তু সে কথা থাক।

জাতি-বিদ্বেষ

জাপানী বিদ্বেষ জাগ্রত করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি শুধু দেখাইতে চাই যে বর্ত্তমানে জগতে অশুভ মনোবৃত্তির বড়ই প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। নহিলে নাৎসী প্রচার কৌশলের সহায়তায়ও জাপানীদের মত সরল সুন্দর জাতির মধ্যে এমন জানোয়ারের সৃষ্টি সম্ভব হইত না।

অথচ পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে আজ বিদ্বেষের নহে সৌহৃদ্যের প্রয়োজন।

ভারতবর্ষের উপরও এই সর্ব্বনাশা শক্তির রক্তলোচন আজ উদ্যত। ইংলণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের মিলিত প্রচেষ্টা যদি ব্যর্থ হয় তবে এশিয়ার অধিকাংশ যে জাপানের গ্রাসে পতিত হইবে, ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

তরুণ বয়স্ক নাৎসীদের মন "ইহুদী ধনীদের জোট্" এবং বিদেশী বণিকদের প্রতি বিদ্বেষে পূর্ণ করিয়া তোলার কোনও চেষ্টারই ত্রুটি হয় নাই। জার্ম্মানীতে নিয়মিতভাবে প্রচার করা

(১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

হজরত ইমাম মাহদীর আগমনের কতিপয় নিদর্শন

[দওলত আহমদ খাঁ খাদিম বি-এল]

আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, আহমদীয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হজরত মীর্জা গোলাম আহমদ (আঃ) দাবী করিয়াছিলেন যে, তিনিই সেই প্রতিশ্রুত মসিহ বা মসিহে মাউদ এবং মাহদিয়ে মস্‌উদ যাঁহার আগমনবার্ত্তা পবিত্র কোরাণে এবং হজরত রছুলে করীমের (দঃ) বাণী অর্থাৎ হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি এই দাবীও করিয়াছিলেন যে, তিনি একদিকে যেমন মোছলমানদের জন্য ইমাম মাহদী তেমনি খৃষ্টান ও ইহুদীদের জন্য মসিহ এবং হিন্দুদের জন্য কল্কি অবতার বা শ্রীকৃষ্ণ, পারসিকদের জন্য মসিত দার্বাহামী এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীদের জন্য বোধিসত্ত্ব। মোটকথা, এছলাম এবং এছলামেতর সমস্ত ধর্ম্মে শেষকালে বা কলিযুগে একজন বিশ্ব-ধর্ম্ম সংস্কারকের আবির্ভাব সম্বন্ধে যে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী আছে, তিনি দাবী করিয়াছিলেন যে, তাঁহারই আগমনে তত্তাবৎ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে। তিনি এই দাবীও করিয়াছিলেন যে, জগতে আজ ইছলাম ধর্ম্ম ব্যতীত অপরাপর সমস্ত ধর্ম্মই মৃত, এবং মহানবী হজরত মোহাম্মদের (দঃ) আধ্যাত্মিক আশীষই মানবজাতির একমাত্র আশা-ভরসার স্থল। সুতরাং সকল ধর্ম্ম এবং তৎসমুদয়ের প্রতিষ্ঠাতা ধর্ম্ম-পুরুষদের আদর্শ আধ্যাত্মিকতা শূন্য হওয়ার দরুণ সেই সমস্ত ধর্ম্মের শিক্ষা বা সেই সমস্ত ধর্ম্ম-সংস্কারকের আদর্শের অনুসরণ করিয়া আজ কেহই কোন প্রকার আধ্যাত্মিক আশীষ (রূহানী-ফয়েজ) লাভ করিতে অর্থাৎ আল্লার সহিত বাক্যালাপ করিবার মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে না। একমাত্র এছলাম ধর্ম্মের শিক্ষা এবং হজরত মোহাম্মদের (দঃ) আদর্শের মধ্যেই এই আশীষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি এই দাবীও করিয়াছিলেন যে, বর্ত্তমানকালের মোছলমানগণ হজরত মোহাম্মদের (দঃ) আদর্শ এবং ইছলামের শিক্ষা হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে এবং তাঁহাদিগকে দ্বিতীয়-বার মোছলমান করিবার জন্য এবং সকল ধর্ম্মের উপর এছলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আল্লাহতা'লা তাঁহাকে প্রত্যাদিষ্ট করিয়াছেন এবং বহু সংখ্যক ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা তাঁহার এই দাবীর যাথার্থ্য প্রতিপাদিত করিয়াছেন।

উপরে যে সমস্ত বিষয় উল্লিখিত হইল, তাহাতে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার দাবী যে কত বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ, তাহা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। এত বড় দাবী কেহ বিনা প্রমাণে গ্রহণ করিবেন, এরূপ আশা করা বৃথা। সুতরাং তাঁহার দাবীর সত্যতার প্রমাণ দেওয়া একান্ত আবশ্যক। দাবীর সত্যতার প্রমাণ অবশ্য দাবীকারক স্বয়ং তাঁহার জীবিত কালে দিয়া থাকেন এবং এক্ষেত্রে তিনি দিয়াছেনও। তাঁহার লিখিত অসংখ্য পুস্তক-পুস্তিকা এবং বক্তৃতাদি পাঠ করিলে নিরপেক্ষ এবং সত্যসন্ধ পাঠক মাত্রই তাহা বুঝিতে পারিবেন। আজিকার আমার এই বক্তৃতায় * তৎসমুদয়ের সম্যক উল্লেখের কোন প্রয়োজন বা সঙ্গতি নাই। আমার আলোচ্য বিষয় শুধু তাঁহার আগমনের পূর্ব্ববর্ত্তী বা সমসাময়িক লক্ষণাদি যাহা কোরাণ এবং হাদিছে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং আমি তাহাই সংক্ষেপে বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিব। কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে আমি এই নিবেদন করিতে চাই যে, কোরাণ এবং হাদিছ হইতে ঐ সমস্ত লক্ষণ গ্রহণ করা অতি দুরূহ ব্যাপার। কারণ, কোরাণ আল্লার বাণী; তাঁহার জ্ঞান অনন্ত এবং অফুরন্ত। সুতরাং কোরাণের আয়েত সমূহের অর্থ এবং ভাবও অনুরূপ অনন্ত এবং অসীম। কোরাণের কোন অর্থ করার পর কেহ এই দাবী করিতে পারেন না যে, ব্যাস! উহাই উহার শেষ অর্থ; অতঃপর উহার আর কোন নূতন অর্থ হইতে পারে না।

তৎপর হাদিছের কথা; উহার জটিলতা সর্ব্বজন-বিদিত। একেত হাদিছগুলি অহি বা এলহাম বা কাশফের ফলে বর্ণিত হইয়াছিল; তারপর আবার সেইগুলি সংগৃহীত হইয়াছে আঁ-হজরতের (দঃ) তিরোধানের দুই চারি শত বৎসর পরে। সুতরাং উহাতে অনেকগুলি এরূপ কথাও স্থান পাইয়াছে যেগুলি হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বর্ণনা করেন নাই এবং যাহা কুলোকেরা স্ব স্ব দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার জন্য স্বয়ং রচনা করিয়া জনসাধারণের মধ্যে হাদিছ বলিয়া চালাইয়া দিয়াছে। হাদিছের সঙ্গে জড়িত ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া সরল-প্রাণ মোছলমানগণ সেইগুলিকেও বিনা প্রমাণে ইছলামের অংশ মনে করিয়া আসিতেছেন। আর কোন বিষয় একবার ধর্ম্ম বিশ্বাসে পরিণত হইলে তাহা দূর করা অতি কঠিন হইয়া পড়ে, তাহা যতই ভ্রান্ত এবং অশুদ্ধ হউক না কেন। এই সমস্ত কারণে কোরাণ এবং হাদিছ হইতে হজরত ইমাম মাহদীর (আঃ) আগমনের লক্ষণ-সমূহ সংগ্রহ করা এক দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। তথাপি তাহা যে অসম্ভব নহে আর একটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিলেই তাহা সম্যক বোধগম্য হইবে। তাহা হইল এই যে, লক্ষণগুলির কোন একটিকে লইলে চলিবে না। সমস্তগুলিকে একত্র করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, মোট ফল কি দাঁড়ায়। তবেই সত্য উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িবে।

যাক সে কথা। এক্ষণে আমি আমার আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব। কিন্তু কেহ যেন এই কথা মনে না করেন যে, আমি যাহা বলিলাম তাহাই সব; এ বিষয়ে আর কিছু বলিবার নাই।

(১) **কালের সাক্ষ্য**—হজরত ইমাম মাহদীর আগমনের লক্ষণাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিলে সর্ব্বপ্রথমে আমাদের চোখে পড়ে কালের সাক্ষ্য। অর্থাৎ গভীর ভাবে মনোনিবেশ করিলে আমাদের

* এই বক্তৃতা তিনি বিগত প্রাদেশিক আহ্‌মদীয়া কন্‌ফারেন্সে প্রদান করেন সঃ আঃ।

একথা বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, বর্ত্তমান কালটাই সেইকাল যখন তাঁহার আবির্ভাব হওয়া একান্ত আবশ্যক ছিল। আমরা প্রতিদিন এবং প্রতি মুহূর্ত্তে আল্লার সৃষ্টির মধ্যে যে নীতির ক্রিয়া দেখিতে পাই তাহা হইল এই যে, তিনি অনাবশ্যক এবং অনর্থক কোন কার্য্য করেন না। কোন জিনিসের প্রয়োজন না হইলে তিনি উহা সৃষ্টি করেন না এবং উহার প্রয়োজন উপস্থিত হইলে উহাকে বাধা দিয়াও রাখেন না। ইহাই আল্লার সনাতন নিয়ম। দেখুন, মানুষের দেহ বা শরীর একটি নশ্বর জিনিষ, অথচ ইহার সংরক্ষণার্থ আল্লাহতা'লা নানাপ্রকারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অথচ মানুষকে তিনি যে আত্মা দিয়াছেন, তাহা অবিনশ্বর, উহার উন্নতি অসীম, এবং উহাই মানুষের সম্মুখে অনন্ত সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করিয়া দিয়াছে। সেইজন্যই একথা অনুমান করিতে কষ্ট হয় না যে, তিনি সেই আত্মার উন্নতির জন্যও নানাপ্রকার বিধান করিয়াছেন। যাক সে কথা! আল্লাহতা'লা কোরাণে বলিয়াছেন—

ان علينا للهدى —"হেদায়েৎ দেওয়া আমাদের কার্য্য।"

বাস্তবিক আল্লাহতা'লা যদি মানুষের হেদায়তের ব্যবস্থা না করিতেন তবে কেয়ামতের দিন মানুষের বিচার করিবার বা মানুষকে শাস্তি দিবার তাঁহার কোন অধিকার জন্মিত না। কোরাণ শরীফ বলিতেছেন :—

ولو انا اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لو لا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى —

"যদি আমরা রছুল পাঠাইবার পূর্ব্বে শাস্তি দিয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিতাম, তবে তাহারা নিশ্চয়ই বলিত, আমাদের নিকটে রছুল প্রেরণ করিলেন না কেন? আমরা সেই অবস্থায় লাঞ্ছিত এবং অপমাণিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার আদেশ মান্য করিয়া লইতাম।"

কোরাণ শরীফে এইরূপ আরও অনেকগুলি আয়েত আছে; সেইগুলি হইতে বুঝা যায় যে, আল্লাহতা'লা সহরগুলিকে ধ্বংস করিবার পূর্ব্বে হেদায়েত প্রেরণ করিয়া থাকেন।

এতদ্ব্যতীত ইছলামের সঙ্গে আল্লার এক বিশেষ প্রতিশ্রুতি আছে। তাহা হইল :—

انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون -

'আমরাই এই শিক্ষাকে অবতীর্ণ করিয়াছি এবং আমরাই ইহার সংরক্ষণ করিব।"

এই যে কোরাণের সংরক্ষণ তাহা দুই প্রকারের; প্রথমতঃ, উহার বাহ্যিক সংরক্ষণ অর্থাৎ ইহার ভাষা! আল্লাহতা'লা এক অলৌকিক উপায়ে কোরাণের বাহ্যিক সংরক্ষণ করিয়াছেন—অর্থাৎ হাফেজদের দ্বারা। পৃথিবীতে এমন ধর্ম্মশাস্ত্র অতি বিরল যাহা আদ্যোপান্ত মুখস্থ করার কোন প্রথা আছে বা তার জন্য বিশেষ এক শ্রেণীর ধর্ম্মবিদ পণ্ডিত আছেন। একমাত্র ইছলাম ধর্ম্মেই একদল লোক আছেন যাঁহারা হাফেজ নামে পারিচিত এবং যাঁহারা কোরাণ আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ জানেন। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক মোছলমানকে নমাজের জন্য কোরাণের কোন না কোন অংশ মুখস্থ করিতে হয়। সুতরাং খোদা না করুন, যদি কোন কারণে কোরাণের সমস্ত কপি ধ্বংসও হইয়া যায়, তথাপি ম্যায় জের-জবর সমস্ত কোরাণকে পুনর্গঠন করিতে অনুমাত্রও বেগ পাইতে হইবে না। কয়েকজন হাফিজ একত্র হইলেই তাহা সমাধা করা যাইবে।

এখন কথা হইল এই, যে-গ্রন্থের শব্দ সংরক্ষণের জন্য এই ব্যবস্থা, উহার ভাব এবং অর্থ সংরক্ষণের জন্য আল্লাহ কি কোন ব্যবস্থা করেন নাই? যদি তাহা না করেন, তবে মানুষ কোরাণের প্রকৃত মর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া যাইবে, শব্দ মাত্রকেই আকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবে, এবং মানব মন হইতে কোরাণের প্রভাব বিদূরিত হইয়া যাইবে। তাহা কখনও আল্লার অভিপ্রেত নয় এবং ছিল না। বরং তাঁর অভিপ্রায় উহার সম্পূর্ণ বিপরীত। হাদিছ শরীপে আছে :—

ان الله يبعث لهذه الامة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها

"অবশ্যই আল্লাহতা'লা এই উম্মতের জন্য প্রত্যেক শতাব্দীর শীর্ষভাগে এরূপ একজন লোককে আবির্ভূত করিবেন যিনি সেই উম্মতের উপকারার্থ উহার ধর্ম্মকে নবীন সাজে সজ্জিত এবং নূতনরূপে রূপায়িত করিয়া দিবেন।" বাস্তবিক এই হাদিছটি এই আয়েতের ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই নহে।

এখন আমাদের বিবেচ্য বিষয় এই যে, বর্ত্তমানকাল বা শতাব্দী কোন মোজাদ্দেদে আবির্ভাবের সময় কি না। হাদিছ তার-স্বরে ঘোষণা করিতেছে যে, প্রত্যেক এক শত বৎসরের মধ্যে একজন করিয়া মোজাদ্দেদের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। তিনি জগতে ইছলামের প্রকৃত তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিবেন। বর্ত্তমানে শতাব্দীর শীর্ষভাগ কেন, অর্দ্ধ শতাব্দীর চেয়েও ৯ বৎসর অধিক উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে—অথচ হিজরী এই ১৩৫৯ সালেও চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ আজ পর্য্যন্ত আসিলেন না কেন?

অপর দিকে বর্ত্তমানে মোছলমান সমাজের কি অবস্থা হইয়াছে তাহা ভাবিলে অশ্রু সংবরণ করা দায়। আজ মোছলমান "ইমান" এবং "আমল" উভয় দিক দিয়াই ইছলাম হইতে বহু দূরে সড়িয়া পড়িয়াছে। কবি বলিয়াছেন—

مسلمانان درگور - ومسلمانی درکتاب

একে তো লোক ইছলাম সম্বন্ধে ঘোর অজ্ঞ। কেহ যদি ইছলাম সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতেও চাহে, তবে তাহাকে প্রবল বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হয়। স্বয়ং আল্লাহতা'লা সম্বন্ধে এরূপ বিশ্বাস বা ধারণা রচিত হইয়াছে যে, সেই সমস্ত স্বীকার করিলে আল্লা যে পবিত্র এবং সকল প্রশংসার উপযুক্ত এবং শ্রেষ্ঠ তাহা বিশ্বাস করা মুশ্‌কিল হইয়া উঠে। যে ফেরেশ্‌তা জাতি সম্বন্ধে আল্লাহতা'লা বলিয়াছেন যে, তাঁহারা যাহা আদেশ করা হয়, তাহাই করেন, তাঁহাদিগকে কোথায়ও বা খোদার নিন্দুক এবং কোথায়ও বা মানব বেশে অবতীর্ণ এবং দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকদের প্রেমিকরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। নবীদের সম্বন্ধে বলা হইয়া থাকে যে, তাঁহারাও (নাউজুবিল্লাহ) মিথ্যা বলিয়া থাকেন এবং খোদার বাণীও শয়তানের প্রভাব হইতে মুক্ত নহেন। জান্নাত এবং দোজখের যে সমস্ত বৈশিষ্ট বর্ণনা করা হইয়া থাকে, তাহাতে হয় ঐ সমস্ত আকায়েদ

চিকিৎসা জগৎ স্তম্ভিত ! চিকিৎসা জগৎ স্তম্ভিত !!

বঙ্গ বিখ্যাত মহামান্য নবাব সার সলিমুল্লা মরহুমের পীর (গুরু) প্রদত্ত—

অত্যাশ্চর্য্য ফলপ্রদ কয়েকটী মহৌষধ, যাহা দি লাইট অব বেঙ্গল কোং-এর দ্বারা প্রস্তুত হইয়া

দি ইউনানী হিন্দুস্থানী দাওয়াখানা কর্ত্তৃক দেশ বিদেশে প্রচারিত হইতেছে।

জগতের অষ্টম আশ্চর্য্য—দি লাইট-অব বেঙ্গল কোম্পানীর—

ইলেক্‌ট্রিক্ কিওর বা পকেট ডাক্তার

ব্যবহার ভেদে বহু রোগনাশক। যথা—রসবাত, হাড় ভাঙ্গা, কাটা, পোড়া ঘা, মাথাধরা এবং যাবতীয় চক্ষু ও কর্ণ রোগে অব্যর্থ। এতদ্ব্যতীত কাশ, হাঁপানী, নিমোনিয়া রোগে ও পেটের বেদনায় বহু প্রশংসিত মহৌষধ। মূল্য ৸০, ডাক মাশুল ॥০ আনা।

শূল সাগর

পিত্তশূল, অম্লশূল, অম্লপিত্ত, কলিজা দরদ প্রভৃতি প্রাণান্তকর ব্যাধিতে যাহারা ভুগিতেছেন, তাহারা কাল বিলম্ব না করিয়া এই তড়িৎ-শক্তি সম্পন্ন মহা ঔষধ শূল সাগরের আশ্রয় গ্রহণ করুন। আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ দিতে প্রতিজ্ঞা করিতেছি। সম্পূর্ণ আরোগ্য উপযোগী মহৌষধের মূল্য ৩৲ টাকা; ডাক মাশুল ॥০ আনা।

যাহারা নানা প্রকার পেটেন্ট ঔষধ সেবন করিয়া বিশ্বাস একেবারেই হারাইয়াছেন তাহাদের সহিত চুক্তির বন্দোবস্ত আছে।

নব যৌবন

ইহা স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য, ধাতু দৌর্ব্বল্য, ধ্বজভঙ্গ, পুরুষত্ব হীনতা (নামর্দ্দমী) ইত্যাদিতে বিশ্ব বিখ্যাত। স্ত্রী কিম্বা পুরুষ সকলেই সুস্থ শরীরে সকল ঋতুতে ব্যবহার করিতে পারেন। ইহা বীর্য্যমণিকে পয়দা করে ও গাঢ় করে। সহবাসে দ্বিগুণ আনন্দ দান করে, পায়খানা খোলাশা করিয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। এতদ্ব্যতীত রক্ত পরিষ্কার ও স্ত্রীলোককে বশীভূত করিতে জগতে ইহা এক অদ্বিতীয় জিনিষ। মূল্য ১৲ টাকা, ডাক মাশুল ॥০ আনা; একত্রে তিন কৌটা লইলে ডাক মাশুল লাগিবে না।

বিজলী মলম

সর্ব্বপ্রকার দাদ ও খোস পাঁচড়া, গর্ম্মির ঘা, বিথাউজ পাপড়ি ইত্যাদি বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় ২৪ ঘণ্টায় আরোগ্য হয়। মূল্য ।৵০ আনা, ৬ কৌটার কম ভিঃ পিঃ করা হয় না। ডাক মাশুল ॥০ আট আনা।

গণোষম

৪০ বৎসরের পরীক্ষিত মেহ রোগের অদ্বিতীয় মহৌষধ। স্ত্রী পুরুষের জন্য সমান ফল; মাত্রায় মাত্রায় রোগ উপশম; ১ দিনে প্রস্রাবের জ্বালা নিবারণ, ১ সপ্তাহে আরোগ্য। মূল্য ২॥০ ও ১॥০ টাকা; মাশুল ॥০ আট আনা।

হিমালয়ান হেয়ার অয়েল

চুল পড়া, অকাল পক্কতা নিবারণ করিতে এবং মস্তিষ্কের বল বিধান ও মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রাখিতে, অনিদ্রা দূর করিতে এবং যাবতীয় শিরঃ রোগে, মাথা জ্বালা, হাত, পা ও চক্ষু জ্বালা ও বিকৃতি মস্তিষ্কে ইহা অতুলনীয়। এইরূপ সর্ব্বগুণ সম্পন্ন বিজ্ঞান সম্মত মহোপকারী কেশ তৈল এ পর্য্যন্ত আর আবিষ্কার হয় নাই। মূল্য ৸০ আনা মাত্র।

শান্তি বটিকা

ইহা সূতিকা রোগের বিশেষ ফলপ্রদ মহৌষধ। এতদ্ব্যতীত পেটফাপা, পেটব্যাথা, অম্ল, অতিসার, অজীর্ণ, প্লীহা (ছাক্ন) এবং কলেরা ইত্যাদি রোগে অতি চমৎকার ফল দর্শায়। মূল্য ॥৵০ আনা, ডাক মাশুল ॥০; একত্রে ৩ কৌটা লইলে ডাক মাশুল নাই।

সোল এজেন্ট ঃ—

দি ইউনান **হিন্দুস্থানী দাওয়াখানা**

৬২নং চক্ সার্কুলার রোড, ঢাকা।

ম্যানেজার—এম, এ, বি, শাহ গোরসাহিদী।

হাদীছুল-মাহদী

এই গ্রন্থে হজরত ইমাম মাহদী ও মসিহ্-মাউদ সংক্রান্ত যাবতীয় জটিল সমস্যার সমধান পেশ করা হইয়াছে। ইহাতে আহমদীয়া জমাতের প্রতিষ্ঠাতা হজরত মীরজা গোলাম আহমদ আঃ-এর প্রতি মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের যাবতীয় এতেরাজের অকাট্য জওয়াব দেওয়া হইয়াছে। সত্যান্বেষী প্রত্যেক মোসলমান ভ্রাতার ইহা এক বার পাঠ করা উচিত। প্রত্যেক আহমদী ভ্রাতার নিকট ইহার এক কপি থাকা অপরিহার্য্য। মূল প্রতি কপি ২৲ টাকা। জিল্‌দা-করা কপি ২॥০ টাকা। ডাক-মাশুল প্রতি কপি ॥০ আনা। একত্রে একাধিক কপি লইলে ডাকা-খরচ কম লাগিবে। সত্বর অর্ডার দিন, নতুবা ফুরাইয়া গেলে পরে আফসোস করিবেন।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—
সেক্রেটারী, বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়া
৪নং বক্সিবাজার, ঢাকা

—বিশুদ্ধতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদ প্রতিষ্ঠান—

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

ব্রাঞ্চ—
ভারতের সর্ব্বত্র
এজেন্সী—
পৃথিবীর সর্ব্বত্র

পত্র লিখিলে বিনা মূল্যে
"স্বাস্থ্যরক্ষাও গৃহ-চিকিৎস"
এবং "আরোগ্যের পথ"
প্রেরিত হয়।

অধ্যক্ষ—যোগেশচন্দ্র ঘোষ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এম্-এ এফ্-সি-এস্ (লণ্ডন), এম্-সি-এস্ (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

যাবতীয় আয়ুর্ব্বেদ ঔষধ আমার নিজ তত্ত্বাবধানে উৎকৃষ্ট উপাদানে প্রস্তুত হয়।

মৃতসঞ্জীবনী (রেজিষ্টার্ড)—বিদেশী ঔষধের মোহমুক্ত হইয়া দেহকে সুস্থ, সবল ও কর্ম্মিষ্ঠ করিতে হইলে এই মৃতসঞ্জীবনী একমাত্র অবলম্বনীয়। প্রসূতিকে সেবন করাইতেই হইবে। জ্বর, সূতিকা, বাত, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, রক্তাল্পতা, রোগান্তে দৌর্ব্বল্য ইত্যাদি অবস্থায় সর্ব্বদা প্রযোজ্য। মূল্য বড় বোতল ৪॥০, মধ্যম ২॥০ ও ছোট ১॥০ মাত্র।

মকরধ্বজ (বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত)—প্রতি তোলা ৪৲ টাকা, সপ্তাহ।০ আনা। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ অনুপানবিশেষে সর্ব্বরোগ দূর করে। ইহা ত্রিদোষের শান্তি করে। সকল রোগে মকরধ্বজের অনুপানবিধি-পুস্তিকা—মূল্য ⁄০ এক আনা।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাস—বহু অর্থ ব্যয় করিয়া চ্যবনপ্রাস প্রস্তুতের এক পৃথক বিভাগ খোলা হইয়া হইয়াছে এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট আমলকী, বংশলোচন এবং অন্যান্য উপাদানে পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করিয়া চ্যবনপ্রাস প্রস্তুত হইতেছে। সর্দ্দি, কাসি, যক্ষ্মা দুর্ব্বলতা, স্মরণশক্তিহীনতায় প্রযোজ্য। ইহা পুষ্টিকর খাদ্যবিশেষ। মূল্য ৩৲ টাকা সের।

শুক্রসঞ্জীবন (রেজিষ্টার্ড)—ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে আজ জাতি ক্ষীণ, দুর্ব্বল ও স্বল্পায়ু হইয়া পড়িয়াছে। যৌবনসুলভ জীবনশক্তি, তেজ ও কান্তি বর্দ্ধনে অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য ১৬৲ সের।

সর্ব্বজ্বর বটী (রেজিষ্টার্ড)—যে কোনও জ্বররোগে অব্যর্থ ঔষধ বলিয়া বহু পরীক্ষিত। জ্বরের এইরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। মূল্য ১৬ বটী ১৲; ৫০ বটী ২৸০; ১০০ বটী ৫৲; ১০০০ বটী ৪৫৲ টাকা

একেবারে কবি কল্পনায়, নতুবা হাস্যোদীপক বস্তুতে পরিণত হইয়া যায়। অপরের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং হজরত মোহাম্মদের (দঃ) প্রতি কখন বা জয়নবের প্রেম কাহিনী এবং কখনও বা জনৈকা চাকরাণীর নিকট গোপন অভিসারে গমন আরোপ করিয়া—তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে হজরত আয়েসা সিদ্দিকার (রাঃ) كان خلقه القرآن এই সাক্ষ্যকেও অকেজো করিয়া দেওয়া হয়।

তারপর কোরান শরীফ সম্বন্ধে "নাছেখ" এবং "মনছুখ" এর থিওরী সৃষ্টি করিয়া কোরাণের গুরুত্ব নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভাবুক এবং চিন্তাশীল লোকদের পক্ষে কোরাণের কোন্ আয়েত আমলযোগ্য এবং কোন্ আয়েত নয়, তাহা নির্ণয় করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। অতঃপর হজরত মুছার (আঃ) শরীয়তের অধীনস্থ জনৈক মৃত ইছরাইলীয় নবীকে ফিরাইয়া আনাইয়া উম্মতে মোহাম্মদীয়ার অনুপযুক্ততা এবং হজরত রছুলুল্লার নিঃসহায়তা প্রকাশ করা হইতেছে।

এই সমস্ত গেল ইমানের অবস্থা। আমলের অবস্থাও তথৈবচ। শতকরা ৭৫ জন লোক হয়তঃ নমাজ-রোজার ধারই ধারে না। জাকাত এক জিনিষ, তাহা অনেকেই দেন না। যাঁহারা দেয়, তাঁহাদের সংখ্যা শতকরা দুই জনের অধিক হইবে না। যাঁহাদের উপর হজ্ব করা ফরজ তাঁহারা হজ্বের নামও করে না। আর যাহাদের পক্ষে হজ্ব করা মোটেই ফরজ নহে, বরং কোন কোন অবস্থায় নিষিদ্ধ তাহারা ভিক্ষা করিয়া হজ্বে গিয়া নিজেরাও লাঞ্ছিত হয় এবং ইছলামকেও অপমানিত করে। এছলামের উত্তরাধিকার আইন আমাদের এই বাংলা দেশ এবং সম্ভবতঃ বিহার এবং যুক্ত প্রদেশ ছাড়া ভারতের সর্ব্বত্র এবং পৃথিবীর আরও অনেক মোছলমান অধ্যুষিত দেশে উপেক্ষিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত পীরপরস্তি, কবর-পরস্তি, মাজার পরস্তি ইত্যাদির অভিসম্পাত ব্যতীত মহরম, সবে-বরাত প্রভৃতি পর্ব্ব উপলক্ষে আরও শত প্রকারের শেরক্ এবং বেদাআত আজ মোছলমান সমাজে প্রবেশ করিয়াছে।

এখন ইমান এবং আমলের দিক দিয়া মোছলমান সমাজের এই অবস্থা, তাহাই কি সাক্ষ্য দিতেছে না যে, কোনও সংস্কারক নিশ্চয়ই আগমন করিয়াছেন? এস্থলে কেহ কেহ এই কথা বলিয়া থাকেন যে, কোরান শরীফ পূর্ণ গ্রন্থ এবং হজরত রছুলুল্লাহ "খাতামুন্ নবীইন" সুতরাং নূতন কোন ধর্ম্ম-সংস্কারকের প্রয়োজন নাই। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, হজরত রছুলুল্লার পরে বিগত ১৩ শত বৎসরের মধ্যে এছলাম ধর্ম্মে এরূপ বহু সংখ্যক পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, যাঁহারা মোজাদ্দেদ নামে অভিহিত এবং যাঁহারা স্বস্ব শক্তি অনুসারে ধর্ম্মের গ্লানি বিদূরিত করিয়া ধর্ম্মের প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা "অহি" বা "এলহাম" লাভ করিয়াছিলেন এবং ইছলামের অতি উচ্চ স্তরের আদর্শ বলিয়া পরিচিত হইয়া গিয়াছেন। যথা—হজরত জুনায়েদ বাগদাদী, ছৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী, শেখ শেহাবুদ্দীন সোহরোওয়ার্দী, হজরত বাহাউদ্দীন নকশবন্দ, হজরত মহিউদ্দীন ইব্নে আরবী, হজরত মইনউদ্দীন চিশ্তী, শেখ আহমদ সিরহিন্দী, শাহ অলিউল্লাহ দেহলবী, ইত্যাদি 'রাহেমাহুমুল্লাহু আজমাইন'। সুতরাং এরূপ লোকের অবির্ভাব এবং কার্য্য যখন আমাদের চোখে পড়ে, তখন আমরা কিরূপে এই কথা স্বীকার করিতে পারি যে, হজরত রছুলুল্লাহর (দঃ) পরে আর কোন সংস্কারকের প্রয়োজন নাই। প্রকৃত কথা এই যে, তাঁহার পরেও সংস্কারকের আবির্ভাব সম্ভব, আর তাহা হইয়াছেও এবং ভবিষ্যতেও হইতে থাকিবে। বর্ত্তমান কালের অবস্থাও তারস্বরে একজন বড় ধর্ম্ম-সংস্কারকের আবির্ভাবের বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে এবং যেহেতু হজরত মির্জা গোলাম আহমদই (আঃ) এইরূপ সংস্কারক হইবার দাবী কারক, সুতরাং এই বিষয়টিও তাঁহার দাবীর সত্যতার একটি মস্ত বড় প্রমাণ বটে।

(২) **নবীজীর (দঃ) সাক্ষ্য।**

ইতিপূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে এই কথা প্রমাণিত হয় যে, বর্ত্তমান কাল একজন ধর্ম্ম-সংস্কারকের যুগ এবং যেহেতু অপর কোন দাবীকারক বিদ্যমান নাই সুতরাং আমরা হজরত আকদাছ মির্জা গোলাম আহমদের (দঃ) দাবী সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে বাধ্য হইয়া যাই। কিন্তু তাঁহার দাবী ছিল যে তিনি প্রতিশ্রুত মসিহ এবং মাহদী; সুতরাং সেই দাবীর সমর্থনে আমি এক্ষণে সৃষ্টির সেরা হজরত মোহাম্মদের (দঃ) সাক্ষ্য উপস্থিত করিব এবং তাঁর সাক্ষ্যের চেয়ে অধিকতর বিশ্বাস-যোগ্য সাক্ষ্য মানবের মধ্যে আর কাহার হইতে পারে?

হজরত মছিহের দ্বিতীয় আগমনের আকিদা (ধর্ম্ম বিশ্বাস) এছলামের যুগ হইতে সুরু হয় নাই, বরং ইহার বহুশত বৎসর পূর্ব্বে হজরত মুছার (আঃ) সময় হইতেই এই আকিদার সূচনা হইয়াছে। কিন্তু ইছলাম ধর্ম্ম ইহার সঙ্গে এরূপ কতকগুলি বিষয় সন্নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছে যে, ইহা ইছলামেরও বিশেষ একটি আকিদার মর্য্যদা লাভ করিয়াছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য :—

(ক) মছিহ মাউদের সময় একজন মাহদীর আগমনের উল্লেখ আছে। তাঁহাকে অন্যান্য হাদীসে বলা হইয়াছে—"লামাহদী ইল্লা ইছা"—অর্থাৎ ইছা ব্যতীত আর কেহই মাহদী নহেন। এই হাদীছের মধ্যে মছিহ মাওউদকেই মাহদী বলার দরুণ মছিহের সঙ্গে মোছলমানদের এরূপ একটি জাতীয় সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে যে, মাত্র এক ধর্ম্মাবলম্বী লোকের সঙ্গেই এরূপ হইতে পারে।

(খ) মছিহের আগমনকে ইছলামের উন্নতির এক নূতন যুগ বলা হইয়াছে এবং অপরাপর সমস্ত ধর্ম্মের উপর ইছলামের বিজয় লাভকে তাঁহার আগমন কাল পর্য্যন্ত মুলতবী করা হইয়াছে।

(গ) মছিহ এবং মাহদীকে এক এবং অভিন্ন সাব্যস্ত করিয়া মছিহের আগমনকে আঁ-হজরতের (দঃ) আগমন বলা হইয়াছে এবং তাঁহাকে যাহারা দর্শন করিবেন তাহাদিগকে ছাহাবা বলা হইয়াছে এবং এইরূপে রছুলের প্রেমিকদের মনে মছিহের জন্য একটি আবেগের সৃষ্টি করা হইয়াছে।

(ঘ) আঁ-হজরত (দঃ) একটি ভীষণ এবং ভয়ঙ্কর যুগের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। তাহাতে ইছলাম সমূলে উৎপাটিত হইয়া যাইত। সেই বিপদ দূরীভূত করিয়া চিরতরে ইছলামের হেফাজতের কার্য্য হজরত মসিহের উপরে ন্যস্ত হইয়াছে। এতদপ্রসঙ্গে كيف تهلك امة انا في اولها والمسيح في اخرها অর্থাৎ "যে উম্মতের প্রথমে আমি এবং শেষে মছিহ, সেই উম্মত

বা জাতি কিরূপে ধ্বংস হইবে"—হজরত রছুলুল্লার (দঃ) এই ভবিষ্যদ্বাণীও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মছিহের আগমন উপলক্ষে যে-সমস্ত হাদিছ পাওয়া যায় তন্মধ্যে সমস্তই রছুলুল্লার বর্ণিত এরূপ ধারণা করা এক মারাত্মক ভুল হইবে। কেননা, বিভিন্ন লোকে স্বস্ব রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নানাপ্রকার অলীক গল্পগুজব গড়িয়া সেগুলিকে হাদিছ বলিয়া চালাইয়া দিয়াছে। সুতরাং এইগুলিকে বাছিয়া প্রকৃত হাদিছগুলিকে একত্র করিয়া যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তৎপ্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইবে।

হজরত রছুলুল্লাহ মছিহের আগমনের যে সমস্ত লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন তন্মধ্যে **খ্রীষ্টান ধর্ম্মের প্রাবল্য** সর্ব্ব প্রথম উল্লেখযোগ্য। নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান ছাহেব তাঁহার লিখিত হুজাজুল-কারামা নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

چون جمله علامات حاصل شود قوم نصارنی غلبه کنند وبر ملك ها ئے بسیار متفرق شد ند

ইহার তুলনায় ইছলামের অবস্থা আঁ-হজরতের (দঃ) ভাষায়

بدء الاسلام غریبا وسیعود غریبا وطوبی للغرباء —

অর্থাৎ **ইস্‌লাম সেই যুগে অতি দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে।** দজ্জাল সংক্রান্ত হাদিছে বলা হইয়াছে যে, বহুসংখ্যক মোছলমান দজ্জালের শিষ্য হইয়া পড়িবে। আর বাস্তবিক হইয়াছেও তাহাই। লক্ষ লক্ষ মোছলমান আজ পবিত্র ইছলাম ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন।

প্রতিশ্রুত মছিহের যুগে মোছলমানদের অবস্থা কি হইবে, আঁ-হজরত (দঃ) উহার একটি বিশদ বিবরণ দিয়া গিয়াছেন। নিম্নে সংক্ষেপে তাহা বর্ণিত হইল।

তখনকার **মোছলমান "কদর" অস্বীকার করিবে।** কেয়ামতের লক্ষণ সমূহের মধ্যে ইহা একটি। নব্য জ্ঞানের গুণে মুগ্ধ মোছলমান বাস্তবিক আজ ইসলামের এই অমূল্য নীতির অস্বীকার করিয়া উহার উপকারিতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ তখনকার মোছলমানগণ **জাকাত দেওয়াকে দণ্ড বিশেষ মনে করিবে।** তখনকার মোছলমানগণের মধ্যে বহুসংখ্যক লোক সামান্য সামান্য **পার্থিব স্বার্থের জন্য ধর্ম্মের স্বার্থকে বলি দিতে কুণ্ঠিত হইবে না।**

তখনকার মোছলমানগণ **নমাজ ছাড়িয়া দিবে।** আর যাহারা নমাজ পড়িবে, তাহারাও অতি তাড়াতাড়ি নমাজ পাঠ করিবে, যেমন মুর্গী দানা খাইবার সময় শীঘ্র শীঘ্র ঠোকর মারিয়া থাকে। তখন **কোরাণ উঠিয়া যাইবে।** আজ যদিও বাহ্যিকভাবে কোরান ঘরে ঘরেই বিদ্যমান আছে, তথাপি ইহার শিক্ষা সম্বন্ধে প্রায় সমস্ত মোছলমানই অজ্ঞ। আর যাহারা কোরান পাঠ করেন এবং অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা মনে করেন যে পূর্ব্বকালের উলেমাগণ কোরানের যে কয়েকখানি তফছির বা ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তদ্ব্যতীত কোরানের আর কোন ব্যাখ্যাই হইতে পারে না।

এখন লোক কোরান শরীফকে বাহ্যিক ভাবে সুন্দর গেলাফ দিয়া বাঁধিয়া তাকে রাখিয়া দেন।

মছজিদের সাজ সজ্জা করা আর একটি লক্ষণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। আজ তাহাও সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। **ইছলাম ধর্ম্মের প্রতি আরব-বাসীদের ঘোর উদাসীনতা** অপর এক লক্ষণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। আজ আরব দেশের লোকেরা ইসলাম ধর্ম্মের প্রতি ঘোর উদাসীন; সুতরাং অজ্ঞ।

আরব দেশ হইতে ধর্ম্মের স্বাধীনতা বিলোপ আর এক লক্ষণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। আজ বাস্তবিক পক্ষে আরব দেশে পরমত সহিষ্ণুতা মোটেই বিদ্যমান নাই। এই কথা আরব ব্যতীত অন্যান্য ইসলামী রাজ্যগুলি সম্বন্ধেও প্রযুজ্য।

এইতো গেল মোছলমানদের অবস্থা। পৃথিবীর নৈতিক অবস্থা বিষয়েও তখন কি পরিবর্ত্তন হইবে, আঁ-হজরত (দঃ) উহারও বিশদ বিবরণ দিয়া গিয়াছেন। তখন **ব্যভিচার প্রবল আকারে দেখা দিবে।** পরদারগমন করিয়া লোক গৌরব প্রকাশ করিবে। ফলে **জারজ সন্তানের সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইবে।** লোক বিবাহকে একটি পুরাতন প্রথা এবং স্ত্রী-পুরুষের স্বাধীনতায় অন্যায় হস্তক্ষেপ মনে করিবে।

মদ্যপান এবং জুয়ার আধিক্যও সেই যুগের লক্ষণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বাস্তবিক আজ স্ত্রী পুরুষের অবাধ মিলন, নাচ-গানের মাহ্‌ফিল, থিয়েটার সিনেমা, হোটেল, রেস্তোরা এবং ক্লাব প্রভৃতির কল্যাণে আজ এই সমস্ত লক্ষণ কিরূপ প্রবল আকারে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

মছিহে মাওউদের আগমনের কালে আর আর যে-সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইবার কথা, তন্মধ্যে তখন **স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষদের চেয়ে অধিকতর হওয়া,** পুরাতন যান বাহন **উষ্ট্র ইত্যাদি পরিত্যক্ত হওয়া** এবং তৎপরিবর্ত্তে নূতন এক অতি ক্ষিপ্রগতি বিশিষ্ট যান আবিষ্কৃত হওয়া, **পুস্তক পুস্তিকার বহুল প্রচার হওয়া,** যাতায়াতের সুবিধা হওয়ায় **বিভিন্ন জাতির লোকের মধ্যে পরস্পর যোগাযোগ সৃষ্টি হওয়া** প্রভৃতি প্রধান। আজ রেলওয়ে, ষ্টীমার, মোটরগাড়ী, এরোপ্লেন প্রভৃতির কল্যাণে এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত এরূপ রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে যে, **মোছলমানের অবস্থা ঈহুদী জাতির মত হইয়া যাইবে। সিরিয়া ফেলিস্তিন তদানীন্তন শাসন-কর্ত্তার হস্তচ্যুত হইবে এবং আরবে অন্তর্ব্বিপ্লব দেখা দিবে।** বিগত মহাযুদ্ধের পরে তুরস্ক সাম্রাজ্যের পতনে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়াছে। **শ্রমিক মজুরদের হস্তে দেশের শাসন ভার চলিয়া যাওয়া, প্রতিনিধিত্ব মূলক শাসন-পদ্ধতি স্থাপিত হওয়া** ও অন্যান্য লক্ষণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে রুশের ভূতপূর্ব্ব রাজবংশের সার নিকোলাসের হত্যার পরে রুশিয়ায় বলশিবিকবাদ স্থাপিত হওয়ায় এবং ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে পরলোকগত মিষ্টার ম্যাকডোলাণ্ডের নায়কত্বে শ্রমিকদলের গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে। আজ আমাদের দেশেও প্রতিনিধিত্ব গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এই লক্ষণটির প্রকাশও কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না।

ভূমিকম্পের আধিক্য এবং তদ্দরুণ অত্যধিক লোকের প্রাণনাশ আর এক লক্ষণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

বাস্তবিক বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে পৃথিবীতে যেরূপ ভূমিকম্প এবং তদ্দরুণ যেরূপ প্রাণনাশ হইয়াছে তৎপূর্ব্বের তিন শত বৎসরের মধ্যেও সেরূপ হয় নাই।

এতদ্ব্যতীত আঁহজরত (দঃ) মাহদীর আগমনের এরূপ একটি যুগ্ম লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন যে তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। তাহা হইল **একই রমজান মাসে সূর্য্য এবং চন্দ্র গ্রহণ হওয়া।** এই লক্ষণটি সম্বন্ধে এই কথা বলা হইয়াছে যে, আকাশ এবং পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি অপর কোন নবী বা ধর্ম্ম-সংস্কারকের আবির্ভাবের পূর্ব্বে এরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইবে না। হাদিসটি নিম্নে দেওয়া হইল :—

ان لمهدينا ايتين لم تكونا منذ خلق السموات والارض ينكسف القمر لاول ليلة من رمضان وتنكسف الشمس فى النصف منه ولم تكونا منذ خلق الله السموات والارض —

"আমাদের মাহদীর দুইটি লক্ষণ আছে। ইহা আকাশ এবং পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। প্রথমটি এই যে রমজান মাসে প্রথম রাত্রিতে চন্দ্রের গ্রহণ হইবে, এবং দ্বিতীয়টি এই যে সেই রমজানে মধ্য তারিখে সূর্য্যের গ্রহণ হইবে এবং এই দুই ঘটনা আকাশ এবং পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি আর সংঘটিত হয় নাই।" এই লক্ষণের ভবিষ্যদ্বাণী ইঞ্জিলেও আছে। মথি লিখিত সুসমাচারে লিখিত হইয়াছে যে, মছিহের (আঃ) আগমনের এই দুইটি বিশেষ লক্ষণ—"সূর্য্য অন্ধকার হইয়া যাইবে এবং চন্দ্রও স্বীয় আলো দিবে না।" ইহার অর্থ সূর্য্য এবং চন্দ্রের গ্রহণ ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। এতদ্ব্যতীত কোরাণ শরীফেও কেয়ামত নিকটবর্ত্তী হওয়ার লক্ষণ-সমূহের মধ্যে সূর্য্য ও চন্দ্রের গ্রহণকে অন্যতম বলা হইয়াছে। কোরাণে আছে :—

يسئل ايان يوم القيامة فاذا برق البصر رخسف القمر وجمع الشمس والقمر — (منكر)

অর্থাৎ "তাহারা জিজ্ঞাসা করে, কেয়ামতের দিন কখন? আমরা উহার লক্ষণ বর্ণনা করিতেছি। তাহা এই যে যখন চক্ষু বিস্মিত হইয়া যাইবে, অর্থাৎ তখন এরূপ ঘটনা-সমূহ সংঘটিত হইবে যে মানব বিস্মিত হইয়া যাইবে, চন্দ্র গ্রহণ হইবে এবং তৎপর চন্দ্র এবং সূর্য্যকে একত্র করা হইবে অর্থাৎ সেই মাসের মধ্যেই চন্দ্র গ্রহণের পরে সূর্য্য গ্রহণ হইবে।" হাদিসে কেয়ামতের নিকটবর্ত্তী সময়ে হজরত মসিহের আবির্ভাব হইবে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; এস্থলে কোরান হইতেও সেই কথার সমর্থন পাওয়া যায়।

বিগত ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে একই রমজান মাসে এই যুগ্ম গ্রহণ সংঘটিত হইয়া মসিহে মাওউদ এবং ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের সময় বলিয়া দিতেছে। কেহ কেহ আপত্তি করেন যে, রমজানের প্রথম তারিখে চন্দ্রগ্রহণ হয় নাই। কিন্তু তাহারা একথাটি ভুলিয়া যান যে, এই হাদিছে চন্দ্রের জন্য قمر শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অথচ আরবী ভাষায় চার তারিখের পূর্ব্বে চন্দ্রকে قمر বলা হয় না। বলা হয় هلال তারপর চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ই তারিখ ব্যতীত বিজ্ঞান মতেও চন্দ্রগ্রহণ হইতে পারে না। এইরূপে দেখিলে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, যে-যে তারিখে চন্দ্র গ্রহণ হইতে পারে তন্মধ্যে ১ম তারিখে চন্দ্র গ্রহণ হইয়াছে এবং যে-যে তারিখে সূর্য্য গ্রহণ হইতে পারে তন্মধ্যে সূর্য্য-গ্রহণ মধ্যবর্ত্তী তারিখে হইয়াছে। হায়! মানুষ কবে শব্দের পূজা ছাড়িয়া দিয়া প্রকৃত মর্ম্মের দিকে ধাবিত হইবে!

দজ্জালের প্রকাশ মসিহ মাউদ এবং ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের আর এক লক্ষণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এবিষয়ে এস্থলে বিস্তারিত আলোচনা অসম্ভব। তবে আঁ-হজরত (দঃ) যখন ছাহাবাদিগকে দজ্জালের প্রকাশের সেই ভয়াবহ ভবিষ্যদ্বাণী শুনাইয়াছিলেন, তখন তিনি ছাহাবাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, দজ্জাল হইতে বাঁচিবার উপায় হইল—কোরান শরীফের সুরা কাহাফের প্রথম দশ আয়েত এবং শেষ দশ আয়েত পাঠ করা। তাহা যদি আমরা পাঠ করি তবে আমরা দেখিতে পাই যে, উপরোক্ত সুরার প্রথম দশ আয়েতে খৃষ্টীয় ত্রিত্ব-বাদের ঘোর নিন্দা করা হইয়াছে এবং শেষের দশ আয়েতে যাহারা খোদা হওয়ার দাবী করে তাহাদেরও নিন্দা করা হইয়াছে। বাস্তবিক আজ জগতে খৃষ্টান পাদরীগণই জগতে একদিকে খৃষ্টীয় ত্রিত্ববাদ প্রচার করিয়া এবং অপর দিকে ইঞ্জিলের মধ্যে স্বকপোল কল্পিত কথা বুঝাইয়া দিয়া প্রকারান্তরে খোদা হওয়ার দাবী করিতেছে। অথচ কোরানে ছুরা মায়দায় বলা হইয়াছে যে, হজরত ঈছা (আঃ) ত্রিত্ব-বাদের প্রচার করেন নাই বরং তিনি একেশ্বর বাদ প্রচার করিয়াছিলেন। আল্লাহ্‌ আমাদের ভ্রান্ত মোছলমান ভ্রাতাদের চক্ষু খুলিয়া দিন, যেন তাহারা সত্য গ্রহণ করিয়া ইহ-পর কালে ধন্য হইতে পারেন। আমীন।

নাজের বয়তুল-মালের আদেশ

কতিপয় বন্ধু স্থানীয় কর্ম্মকর্ত্তাগণের সহিত কোন কথায় অসন্তুষ্ট হইয়া সোজাসোজি কাদিয়ান চাঁদা পাঠাইতে আরম্ভ করে। এ সম্পর্কে এতদ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে, হজরত আমীরুল-মোমেনীন (আইঃ) এইরূপে চাঁদা প্রেরণ পছন্দ করেন না। ফলতঃ হুজুর (আইঃ) বলিয়াছেন যে, কেহ যদি স্বেচ্ছায় স্থানীয় জমাতের মারফত চাঁদা না পাঠাইয়া সোজাসোজি মরকেজে (কেন্দ্রে) চাঁদা পাঠান তবে তাহার চাঁদা গ্রহণ করা হইবে না। মোকামী আঞ্জোমনের মারফত না পাঠাইয়া সোজাসোজি কাদিয়ানে চাঁদা পাঠান কেবল যে জমাতের একতার বিরোধী, তাহা নহে, বরং ইহাতে ঝগড়া-বিবাদের প্রশ্রয় দেওয়া হয় এবং সিলসিলার নেজাম তাহা সহ্য করিতে পারে না। অতএব বন্ধুগণ ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইবেন। কেহ যদি কোন বিশেষ কারণ বশতঃ সোজাসোজি চাঁদা প্রেরণ অত্যাবশ্যকীয় মনে করেন তবে সেই কারণ দর্শাইয়া নাজের বয়তুল-মাল হইতে অনুমতি লইবেন।

নাজের-বয়তুলমাল

(চতুর্থ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

হইয়াছে যে ইহারাই জগতের সকল অনিষ্টের মূল; তাহা ছাড়া যুদ্ধই পুরুষের উপযুক্ত ক্রীড়া এবং অন্যান্য দেশের রাজ্য হরণ না করিয়া নিজ দেশের বিস্তৃতি সাধান করা যায় না! মুসোলিনীর ইতালীর কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করার পর হইতে সেখানেও অনুরূপ প্রচার চলিয়া আসিতেছে। জাপানী জনসাধারণের মধ্যেও এই শ্রেণীর জাতি-বিদ্বেষ প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এ কার্য্য খুব কঠিন হয় নাই। জাপানীদের ধারণা জগতের জাতিনিচয়ের মধ্যে একমাত্র তাহারাই দেবীর সন্তান এবং সেই কারণে ঈশ্বরের প্রিয় জাতি—যেন আর সকলে ঈশ্বরের সন্তান নহে। সুতরাং জাতি-বিদ্বেষ সৃষ্টি করা জাপানে খুব কঠিন হয় নাই।

জাপানের নেতারা জাপানীদের বুঝাইতেছে যে, গত অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া শ্বেতকায় জাতিগুলি তাহাদের সুখের পথে অন্তরায় হইয়া আছে। ১৮৯৫ সালের চীন-জাপান যুদ্ধের পর জাপান চীনে যে সকল সুবিধা অর্জ্জন করিয়াছিল তাহা হইতে বৈদেশিক শক্তিরাই জাপানকে আংশিকভাবে বঞ্চিত করিয়াছে; ১৯০৫ সালে রুশিয়ার সহিত যুদ্ধে জিতিবার পরও জাপান অনুরূপ ভাবে বঞ্চিত হয়; অতঃপর জাপানীদের অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড এবং আমেরিকাতে যাইয়া বসবাস করার পক্ষে বিঘ্ন উপস্থিত করা হইল। অথচ বর্দ্ধিত লোক সংখ্যার কিছু কিছু বাহিরে চালান দেওয়া জাপানের পক্ষে বড়ই প্রয়োজন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র জাপানীদের পৌর অধিকারের অনুপযুক্ত বিবেচনা করিল, ইহা কি কম অপমানের কথা! ইত্যাদি ইত্যাদি।

ব্যাপক প্রচারের ফলে সরল জাপানীদের চিত্ত আজ বিদ্বেষে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সৈন্যদলের সংহতিও আজ এই জাতি-বিদ্বেষের ভিত্তির উপরই স্থাপিত। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জাপানী সৈন্যেরা জাত্যাভিমান পূর্ণ এই সকল জাপানী নেতাদের উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য করিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইহারা যে কোনও বর্ব্বরতা করিতে পারে। যে মূর্খ সৈন্যগুলির হাতে আমাকে নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল তাহাদের অধিকাংশের বয়সই কুড়ি পার হয় নাই, কিন্তু এই অল্প বয়সেই তাহাদিগকে সম্পূর্ণ ক্ষ্যাপাইয়া তোলা হইয়াছে। চীনা বা শ্বেতকায় জাতির লোকেরা তাহাদের উপহাসের পাত্র যেমন ইহুদীরা নাৎসী ছেলেদের এবং হাব্‌সীরা ইতালীয়দের হাসির পাত্র।

হারবিনে ষ্টেশান মাষ্টারের অফিসে পূর্ব্বোক্ত ঘটনা সম্পর্কে একজন জাপানী সৈন্যাধ্যক্ষের সহিত বহু তর্ক করিতে হইল। অতঃপর অন্তের পক্ষে আমাদের দেশের কন্‌সাল উপস্থিত হইলে সে তাড়াতাড়ি এক গল্প বানাইয়া ফেলিল। কহিল, "ট্রেণে দুইটা ডাকাত যাইতেছিল; সৈন্যদের উপর আদেশ ছিল, তাহারা যেন গাড়ীর মধ্য দিয়া যাইতে না পারে।" কিন্তু এ বিষয়ে আর আমার উৎসাহ ছিল না। আমি ভাবিতে লাগিলাম, জাতিবিদ্বেষ উস্কাইয়া দেওয়া কোনও জাতির পক্ষেই কঠিন নয়, জনসাধারণের প্রতিহিংসার বিষে বিষাক্ত করিয়া তোলাও সহজ। কিন্তু ইহা কি অভিপ্রেত? এইরূপ জাতি-বিদ্বেষের পরিণাম আত্মঘাতী যুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই নহে। যে-পর্য্যন্ত না জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ সৃষ্টির প্রচেষ্টাকে সকলেই ঘৃণার চোখে না দেখিবে ততদিন শান্তির আশা নাই, সাধারণ মানুষের সুখেরও আশা নাই।

কেন্দ্রীয় এসেম্‌ব্‌লীতে আধ্যাত্মিক শিক্ষা

অনারেবল সার মোহাম্মদ জাফরউল্লাহ খাঁর বক্তৃতা

সম্প্রতি অনারেবল চৌধুরী ডাক্তার সার মোহাম্মদ জাফরউল্লাহ্‌ খান, সি, এস, আই, ভারত গবর্ণমেণ্টের আইন সচিব কেন্দ্রীয় এসেম্‌ব্‌লীতে ফাইনেন্স বিল আলোচনা উপলক্ষে এক সার-গর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার এই বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা হইয়াছে। এই বক্তৃতায় তিনি বর্ত্তমান যুদ্ধের কারণ ও তাহা হইতে উদ্ধার লাভের উপায় সম্বন্ধে বলিতে গিয়া উহার ভৌতিক দিক বর্ণনা করার পর উহার আধ্যাত্মিক দিকও বর্ণনা করেন। আধ্যাত্মিক বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি বলেন :--

"এই বিংশ শতাব্দীতে মানুষের সুখ-সমৃদ্ধির উপকরণ পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণ অধিক হইয়াছে, অথচ আমরা নিজ চক্ষে দেখিতেছি যে, এই সকল উপকরণ মানব জাতির ধ্বংসেরই কারণ হইয়াছে। ইহার কারণ কি? আমার বিশ্বাস, ইহার কারণ এই যে, আমরা হৃদয় হইতে খোদাকে বাহির করিয়া দিয়াছি এবং মিথ্যা খোদাকে তথায় আসন দিয়াছি—হৃদয়ে অহঙ্কার, ঔদ্ধৈত্য, লোভ, কুচিন্তা ও স্বার্থপরতাকে স্থান দিয়াছি। খোদার সম্মুখে কুকর্ম্ম সমূহ করা হইতেছে, ফলে তিনি কোপিত হইয়া মানবকে তাহাদের কুকার্য্যের সাজা দিতেছেন। এখন প্রশ্ন এই যে, মানুষ এই ধ্বংসের হস্ত হইতে কি করিয়া রক্ষা পাইতে পারে? ইহার একমাত্র উপায় এই যে, আমরা হৃদয়ের পুঞ্জীভূত কুচিন্তা সমূহ দূর করিয়া হৃদয়কে পবিত্র করি এবং এই সকল মিথ্যা খোদার অস্তিত্ব হইতে উহাকে এমন ভাবে পবিত্র করি যেন সত্যিকারের এক ও অদ্বিতীয় খোদার তথায় গৌরব-ময় বিকাশ হয়।

এই মহান উদ্দেশ্য অস্ত্র বা অন্য কোন ভৌতিক উপকরণের সাহায্যে লাভ হইতে পারে না। অস্ত্রের সাহায্যে আমরা আক্রমণকারীকে ধ্বংস করিতে পারি, কিন্তু আক্রমণ-কারীকে বিধ্বস্ত করাই মানব-জাতির উদ্ধারের জন্য যথেষ্ট নহে। ইহাতে মানুষের দেহ ত রক্ষা পাইতে পারে, কিন্তু তাহার আত্মা পবিত্র হইতে পারে না। আক্রমণকারীদিগকে পারাভূত করার পর বিপন্ন লোকদিগকে আধ্যাত্মিক হেফাজতের ছায়া তলে আনিতে হইবে। আমরা যদি নিজদিগকে খোদার ইচ্ছায় ছাড়িয়া দেই তবেই এই মহান উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। মানুষের মধ্যে খোদার জ্যোতিঃ রহিয়াছে। মানুষকে তাহার জীবনের পবিত্র উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে হইবে। তৎপর সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তন-মন উৎসর্গ করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য কেবল বিনয় ও আন্তরিকতা সহকারে দোয়া করিলেই মানুষ উপলব্ধি করিতে পারে। একীন (দৃঢ় প্রত্যয়) রাখিবেন, আজও খোদা দোয়া সেই রূপেই শুনেন, যেমন তিনি পূর্ব্বে শুনিতেন। তিনি এখনো তাঁর দাসের সঙ্গে সেই রূপই কথা বলেন যেমন তিনি পূর্ব্বে বলিতেন। প্রয়োজন কেবল হৃদয়ের কর্ণ দ্বারা তাঁহার পয়গাম শ্রবণ করা। তিনি বলিয়াছেন, "যে আমাকে লাভ করিবার চেষ্টা করে আমি তাহাকে আমাকে পাওয়ার পথ দেখাইয়া দেই"—"পথ প্রদর্শিত হইলে সেই পথের অনুসরণ করিও, তাহা হইলে তোমাদের আর কোনও দুঃখ ও ভয় থাকিবে না"—এবং "হে পয়গম্বর, আমার বান্দাগণ যখন তোমার কাছে আসে এবং তোমাকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, তখন বলিয়া দিও যে, আমি তাহাদের সন্নিকট।"

জগৎ আমাদের

কাদিয়ানে বার্ষিক সম্মেলনে যোগদানের সাড়া

কাদিয়ানে সালানা-জলসা বা বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে অতিথি-সমাগমের সাড়া পড়িয়াছে। প্রত্যহ সহস্র সহস্র অতিথি জগতের বিভিন্ন স্থান হইতে সমবেত হইতেছেন। অতিথিগণের আগমনের জন্য রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ স্পেশাল ট্রেণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অনারেবল চৌধুরী সার মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ্ খা সি-এস-আই বাহাদুর সিমলা হইতে, ছাহেব-জাদা মীরজা মোজাফর আহমদ সাহেব, আই-সি-এস হেসার হইতে, নোওয়াব আবদুর রাহমান খান সাহেব মালিরকোটলা হইতে এবং মিয়া আব্বাছ আহমদ খান সাহেব দিল্লী হইতে তশরীফ আনয়ন করিয়াছেন। আরো বহু লোক প্রত্যেক ট্রেনে দূর ও নিকট হইতে আগমন করিতেছেন। ২৫শে ডিসেম্বর প্রাতে অতিথিগণের সংখ্যা মোট ৪৪৫০ জন ছিল। ঐ তারিখে সন্ধ্যায় অতিথি সংখ্যা হইয়াছে ৯৭৯৬।

হৃদয়-বিদারক শোক-সংবাদ

পাঠক-পাঠিকাগণ শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইবেন যে, সেখ আতা মোহাম্মদ সাহেব (সার ডাক্তার মোহাম্মদ একবালের জেষ্ঠ ভ্রাতা) আর ইহলোকে নাই। ইন্নলিল্লাহি-ওয়া-ইন্না-ইলায়হি রাজেউন। তিনি হজরত মসিহ মাওউদের (আঃ) হস্তে দীক্ষা গ্রহণ করতঃ আহমদীয়া জমাতে দাখেল হইয়াছিলেন; অতপর আমাদের বর্ত্তমান ইমাম হজরত আমীরুল-মোমেনীনের হস্তে খেলফতের দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি এক জন নিষ্ঠাবান আহমদী ছিলেন। বন্ধুগণ তাঁহার আত্মার মঙ্গলের জন্য দোয়া করিবেন।

বগুড়ায় সর্ব্ব-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক দিবস

বিগত ১লা ডিসেম্বর তারিখে স্থানীয় আহমদীগণের উদ্যোগে বগুড়া উত্তরা-হাউসে বিভিন্ন ধর্ম্ম-গুরুর জীবন চরিত আলোচনা করিবার জন্য এক সভার অধিবেশন হয়। বাবু সুরেশ চন্দ্র দাস গুপ্ত বি-এল সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। মাননীয় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে, সি, বসাক আই, সি, এস সভার উদ্বোধন করেন। বাবু প্রভাস চন্দ্র সেন বি-এল, বাবু যতীন্দ্র মোহন রায় বি-এ, বাবু নরেন্দ্র শঙ্কর দাস-গুপ্ত বি-এল, মৌলবী নবীরুদ্দীন তালুকদার বি-এল প্রভৃতি বক্তাগণ শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, এমাম আবুহানিফা, রাজা রামমোহন রায়, রামকৃষ্ণ ইত্যাদি ধর্ম্ম-গুরুদিগের জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

আহমদী-পাড়ায় তালীম-তরবীয়ত

ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া আহমদী পাড়া আঞ্জোমনে আহমদীয়ার প্রেসিডেন্ট মুন্সি আবদুল করীম সাহেবের উদ্যোগে পাড়ার ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার জন্য সমস্ত মহল্লায় মোট ৯ টি স্কুল হইয়াছে। ঐ সমস্ত স্কুলে ছেলে-মেয়েরা অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে কোরান ও উর্দ্দুও পড়ে। বা-জমাত নামাজও রীতিমত হইতেছে। খোদ্দামুল-আহমদীয়ার মেম্বরগণ এই কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য সহায়তা করিতেছেন। আল্লাহতালা তাঁহাদের প্রচেষ্টাতে বরকত দিন, আমীন।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া খোদ্দামুল-আহ্‌মদীয়া
নূতন বর্ষের কর্ম্মচারীর নির্ব্বাচন

গত ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৪০, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আহমদীয়া মসজিদে স্থানীয় মজলিসে-খোদ্দামুল-আহমদীয়ার ১৯৪১ সনের নূতন কর্ম্মচারী নির্ব্বাচনের জন্য এক বৈঠক হয়। তাহাতে মাষ্টার আবদুল মতিন চৌধুরী সাহেব এবং মাষ্টার আবদুল মালেক সাহেব যথাক্রমে কায়েদ ও সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত হন। কাদিয়ানের কেন্দ্রীয় মজলিসে-খোদ্দামুল-আহমদীয়ার সদর বা প্রেসিডেন্ট সাহেব সেই নির্ব্বাচন সমর্থন করিয়া মঞ্জুরী পত্র পাঠাইয়াছেন। ইন্‌শা-আল্লাহ আগামী ১লা জানুয়ারী, ১৯৪১, হইতে নূতন কর্ম্মচারীগণ কার্য্য আরম্ভ করিবেন। আল্লাহ্‌তলা তাঁহাদের কার্য্যে বরকত দিন, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

দোয়ার আবেদন

নিম্নলিখিত ভ্রাতাভগ্নিগণ পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতার জন্য দোয়ার আবেদন জানাইয়াছেন। বন্ধুগণ তাঁহাদের জন্য দোয়া করিবেন।

১।	মোসাম্মৎ শহীদুন্নেছা, আহমদীপাড়া	...	উচ্চ প্রাইমারী
২।	„ হনুফা বিবি „	...	„
৩।	মাষ্টার ফরীদ আহমদ „	...	„
৪।	মোসাম্মত ফয়জুন্নেছা „	...	নিম্ন প্রাইমারী
৫।	মাষ্টার আবদুল আলী, শুহিলপুর	...	গুরুট্রেনিং
৬।	মাষ্টার ছালাহ উদ্দীন চৌধুরী, দেবগ্রাম	..	মেট্রিক

সরাইল আঞ্জোমন আহমদীয়ার নূতন সংগঠন

আমাদের সরাইল আঞ্জোমনে-আহমদীয়ার ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট মরহুম মৌলবী মীর সেকান্দর আলী সাহেবের পরলোকগমনের পর মৌলবী মীর সিদ্দিক আলী সাহেব ও মাষ্টার আবদুল মোত্তালেব সাহেব উক্ত আঞ্জোমনের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাদের এই অভিষেক মোবারক করুন এবং তাঁহাদিগকে সিলসিলার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিবার তৌফিক দিন, আমীন।

তাহরিক-জাদিদের সপ্তম বর্ষের ওয়াদা
(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

১।	মিষ্টার মোহাম্মদ মোস্তফা—	১০৲
২।	মৌলবী মীর মাহবুব আলী সাহেব—	৬৲
৩।	মিষ্টার এ, বি, মোহাম্মদ আইয়ুব—	৫৲
৪।	কাজী আবদুছ ছাঈদ সাহেব—	৫।৶০
৫।	মিষ্টার নবীউল্ ইক—	৫।৶০
৬।	মৌলবী আবদুর রাহমান খাঁ—	৩৩৷৷০
৭।	মিসেস আবদুর রাহমান খাঁ—	৫।৶০
৮।	হাফিজ মোহাম্মদ তায়েবুল্লা সাহেব— ১ম বর্ষ—৫৲০, ২য় বর্ষ—৫৶০, ৩য় বর্ষ—৫৷৶০, ৭ম বর্ষ—৫।৶০	
৯।	মৌলবী এ, কে, এম, খলিলুর রাহমান সাহেব—	৭০৲
১০।	হাকীম সাজেদুর রাহমান সাহেব— ১ম বর্ষ—৫৲, ২য় বর্ষ—৫৲০, ৩য় বর্ষ—৫৶০, ৪র্থ বর্ষ—৫৷৶০, ৫ম বর্ষ—৫।০, ৬ষ্ঠ বর্ষ—৫।৲০, ৭ম বর্ষ—৫।৶০,	
১১।	মিসেস আবেদা বেগম, ঢাকা— ৭ম বর্ষ—৫।৶০	

তাহরিক-জাদীদে* উল্লেখ-যোগ্য দান

অনারেবল নোওয়াব চৌধুরী মোহাম্মদ্দীন সাহেব—রেভিনিউ মিনিষ্টার, যোধপুর, তাহরিক জদীদের সপ্তম বর্ষের জন্য দুই হাজার তিন শত দশ টাকা দান করিরাছেন। আল্লাহ্‌ তা'লা তাঁহাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং নিজ করুণার ছায়াতলে রাখুন।

আহ! অহিদ উদ্দিন ঠাকুর

সরাইল আঞ্জোমনে আহমদীয়ার অন্যতম কর্ম্মী মৌলবী অহিদ উদ্দীন ঠাকুর সাহেব কিছুদিন হইল ৪০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ইন্নালিল্লাহি-ওয়া-ইন্না-ইলায়হে রাজেউন। তিনি আমাদের এক জন উৎসাহী কর্ম্মী ছিলেন এবং কবিও ছিলেন। বিগত ১৫ই নবেম্বর, ১৯৪০ তারিখের আহমদীতে "ভারতে আবার কৃষ্ণ" শীর্ষক তাঁহার এক খানা কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। মৃত্যু-কালে তাঁহার কাগজাদি তালাস করিয়া আরো কয়েকটি কবিতা পাওয়া গিয়াছে। নিম্নে তাহা প্রকাশ করা গেল। বন্ধুগণ তাঁহার আত্মার উন্নতির জন্য দোয়া করিবেন।

ইসলামের কৃষ্ণ

(এই কবিতাটি, ঠাকুর সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র মুখস্থ রাখিয়াছেন। তাঁহার নিজ হস্তলিপি পাওয়া গেল না। ইহার মাঝে আরও কয়েকটি লাইন ছিল, তাহা স্মৃতি-বিচ্যুত হইয়াছে। এই কবিতাটি তিনি ১৯৩৫ সনে লিখিয়াছেন।)

ইস্‌লামের ঐ ফুল-বাগানে,
বাজায় গোপাল মোহন বাঁশী।
ঐ বাঁশীর আকুল তানে,
খোদার প্রেমে যাও গো মিশি।
কল্কিরূপি আহমদ গাজী,
ধর্ম্ম বিলিছে অধর্ম্ম নাশী॥
এ যুগে লোক হয়েছে বাসি (পঁচা)
এসেছে কৃষ্ণ বাজাতে বাঁশী।
এ সো গো আজি এ যুগ-বাসী,
প্রেম দরিয়ায় যাও গো মিশি॥

—অহিদ উদ্দিন ঠাকুর (মরহুম)

সমর আহ্বান

চল চল মোছ্‌লেম সমর ক্ষেত্রে—
সম্রাট বিপন্ন তোর।
মত্ত চিত্ত করিতে নৃত্য—
মাতিব সমরে ঘোর॥
অন্যায় সমরে জার্ম্মান ধাইছে;
বৃটেন বিক্রমে তার সনে যুঝিছে॥ ২
রাজভক্ত যে বা বীরপুত্র বটে;
নাৎসি নাশিতে এস সবে ছুটে॥ ২
ভীম বলে সবে বল্ল বন্দুক করে।
ঝাপায়ে পড়িব বিপক্ষ সমরে॥ ২
অর্জ্জিতে মান বর্জ্জিব প্রাণ—
রক্ষিব বৃটেনে মোর॥ ২

—অহিদ উদ্দিন ঠাকুর (মরহুম)

---

* আহমদীয়া জমাতের বর্ত্তমান নেতা জমাতের সম্মুখে একটি দশবর্ষীয় স্কীম পেশ করিয়াছেন। তাহাতে আহমদীগণকে সরল জীবন যাপনের জন্য আদেশ করিয়াছেন এবং ইসলাম প্রচারের জন্য একটী স্থায়ী ফাণ্ড গঠন করিতে সক্ষম ভ্রাতা-ভগ্নিগণকে অন্ততঃ পাঁচ টাকা করিয়া এই ফণ্ডে চাঁদা দিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। সে-মতে বহু ভ্রাতাভগ্নি বিগত পাঁচ বৎসর যাবৎ নিজ নিজ ক্ষমতানুযায়ী পাঁচ, দশ, পঁচিশ, পঞ্চাশ শত বা সহস্র টাকা করিয়া দিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি সপ্তম বর্ষের চাঁদার আহ্বান করা হইয়াছে এবং ভ্রাতা-ভগ্নিগণ তাহাতে সাড়া দিয়া নিজ নিজ ওয়াদা পেশ করিতেছেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

ঢাকা মিউনিসিপালিটির পক্ষ হইতে বাড়ীর নম্বর পরিবর্ত্তন হওয়ায় এখন হইতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়ার আফিসের ঠিকানা ৪নং বক্সিবাজার রোড্‌ হইয়াছে। আঞ্জোমন পূর্ব্বকার বাটিতে আছে, কেবল বাড়ীর নম্বর পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অতএব বন্ধুগণ এখন হইতে চিঠি-পত্রাদি লিখিতে বা মণিঅর্ডার ইত্যাদি করিতে ১৫নং না লিখিয়া ৪নং বক্সিবাজার লিখিবেন।

হজরত মোহাম্মদ ও স্বর্গ-বিজয়

এই পুস্তিকায় নূতন আলোতে নূতন ধরণে হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা ছাঃ-এর শিক্ষা পেশ করা হইরাছে। বন্ধুগণ ইহা পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইবেন। সত্বর সংগ্রহ করুন। মূল্য প্রতি কপি মাত্র দুই পয়সা। একত্রে ১০০ কপি ২৲ টাকা।

Printed by D. N. Chakraborty at the Wari Printing Works, Dacca and Published & Edited by Abdur Rahman Khan B. A. from the Wari Printing Works, Wari Dacca. (Bengal).